Sheba Prokashoni-Kishore Somogro
facebook.com/ClassicBooksOfShebaProkashon

তিন গোয়েন্দা

দুর্গম কারাগার

রকিব হাসান

রবিনের বাবা নিখোঁজ।
ধারণা করা হচ্ছে, ভয়ঙ্কর শাখালিন কারাগারে
আটকে রাখা হয়েছে তাঁকে।
সাইবেরিয়ার উপকূলে গাল্‌ফ্ অভ টারটারি আর
সী অভ অখোটস্কের মাঝের একটা দ্বীপ শাখালিন।
পৃথিবীর জঘন্যতম জায়গা।
বেঁচে থাকা ওখানে জীবন্মৃতের সামিল।
বাবাকে উদ্ধার করতে যেতে তৈরি হলো রবিন।
সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল দুই বন্ধু: কিশোর আর মুসা।
তিন গোয়েন্দার সঙ্গী হলো আরও একজন,
দুর্ধর্ষ বেদুইন বৈমানিক, ওমর শরীফ।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

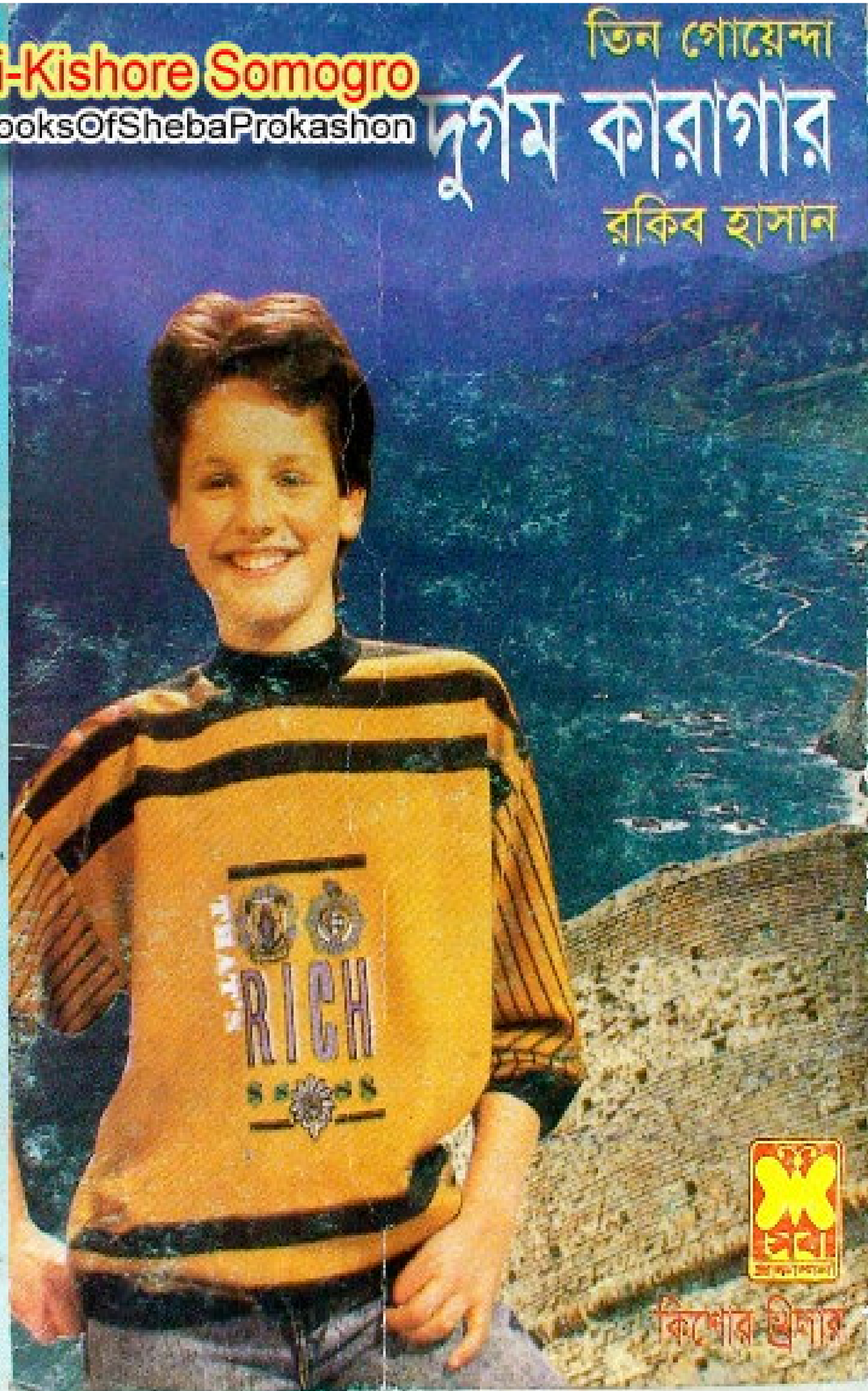

Sheba Prokashoni-Kishore Somogro
Sheba Prokashoni-Kishore Somogro
Book Series
Liked
Following
Message
Timeline
About
Photos
Likes
More

দুর্গম কারাগার

প্রথম প্রকাশ: ২০০০

একঘেয়ে গুঞ্জন তুলে আকাশের যতটা সম্ভব ওপর দিয়ে উড়ে চলেছে ওকিমুরো কর্পোরেশনের একটা মার্লিন বিমান। নিচে মধ্যরাতের চাঁদ আর তারার আলোয় চকচক করছে উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরের বরফ শীতল পানি। পশ্চিমে দেখা যাচ্ছে জাপানের উত্তর সীমান্ত থেকে শাখালিন দ্বীপকে আলাদা করে রাখা সঙ্কীর্ণ লা পেরুজ স্ট্রেইট। পুবে, বেশ কিছুটা দূরে, সীমান্ত রেখা দেশে অস্পষ্ট হয়ে আছে কুরাইল আইল্যান্ড। সামনে শাখালিন দ্বীপ ক্রমশ এগিয়ে গেছে অরোরা বোরিয়ালিসের ফ্যাকাসে রশ্মির দিকে। পুঞ্জীভূত কালো দঙ্গল যেন। এখানে ওখানে দু'চারটা মিটমিটে আলো।

চুপচাপ দেখছে ওমরের পাশে বসা কিশোর। প্লেন চালাচ্ছে ওমর।

নিরাপদেই এসেছে এতক্ষণ। আমেরিকা থেকে রওনা হয়েছিল সাত দিন আগে। পথে কয়েকটা এয়ার পোর্টে নামতে হয়েছে। তেল নেয়া আর কাস্টমসের ঝামেলা মিটানোর জন্যে। সর্বশেষ স্টপেজ জাপানের উত্তর সীমান্তের একটা অখ্যাত বিমান বন্দর। সেটা থেকে উড়েই এখন এখানে পৌঁছেছে।

ওদের লক্ষ্যস্থল শাখালিন দ্বীপ। সাইবেরিয়ার উপকূলে গাল্ফ অভ টারটারি আর সী অভ অখোটস্কের মাঝের এই দ্বীপটা জাপানের খুব কাছে। মালিক রাশিয়া। জারদের আমল থেকেই এর বদনাম। শাখালিন কারাগারের নাম শুনলে বড় বড় চোর-ডাকাতেরও বুক কেঁপে উঠত। প্রধানত রাজনৈতিক বন্দিদের পাঠানো হত ওখানে। জারেরা গেল, সমাজতন্ত্র এল, তারও অনেক পরে ভেঙে টুকরো টুকরো হলো রাশিয়া, কিন্তু শোনা যায় শাখালিন যা ছিল তা-ই রয়ে গেছে আজও; শাস্তির নামে মানুষকে পাঠানো হত ওখানে এক সময় অমানবিক অত্যাচার সয়ে তিলে তিলে ধ্বংস হওয়ার জন্যে, পুরো মানবজাতির ওপর তীব্র ঘৃণা আর অভিমান নিয়ে মরার জন্যে।

শাখালিন—ছয়শো মাইল লম্বা; চওড়ায় কোথাও একশো পঁচিশ, কোথাও বা আরও কম, মাত্র ষোলো মাইল। সাইবেরিয়ার মূল ভূখণ্ড থেকে আলাদা করে রেখেছে ওটাকে যে গাল্ফ অভ টারটারি, সেটাও চওড়ায় এক রকম নয়—কোথাও আট মাইল, কোথাও বিশ। দ্বীপের উত্তর-দক্ষিণে মেরুদণ্ডের মত গজিয়ে ওঠা পর্বতমালার সবচেয়ে উঁচু অংশটার উচ্চতা পাঁচ হাজার ফুট। পুরো দ্বীপটাই প্রায় ফার আর লার্চ বনে ছাওয়া; তার মধ্যে বাস করে এলক হরিণ, ভালুক, নেকড়ে আর শীতপ্রধান অঞ্চলের নানা রকম জানোয়ার—শীতের সময় তাতার প্যাসেজ জমে গেলে মূল ভূখণ্ড থেকে বরফের ওপর দিয়ে হেঁটে পার হয়ে চলে আসে ওগুলো।

বছরের বারো মাসই শীত থাকে এখানে, সূর্যের দেখা পাওয়া ভার। শুধু শিকার আর মাছ ধরার ওপর নির্ভর করে আদিম কায়দায় জীবন টেনে নিয়ে বেড়ায় এখানে কিছু প্রাচীন উপজাতির মানুষ। ওদের প্রধান খাদ্য শুকনো মাছ। বড় বড় কাঁকড়া রোদে শুকিয়ে, গুঁড়ো করে রুটির মত বানিয়ে খায়। তেল, কয়লা আর নানা রকম খনিজ প্রচুর পাওয়া যায় ওখানে। প্রধান দুটো শহরের নাম ডুই আর আলেকজান্দ্রোভস্ক।

ভাবছে কিশোর। এখানে আসার উদ্দেশ্য—রবিনের বাবা মিস্টার মিলফোর্ডকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া। ছয় মাস আগে আমেরিকা থেকে জাপানের উদ্দেশে রওনা দিয়ে নিখোঁজ হয়েছেন তিনি। তদন্ত করে জানতে পেরেছে তিন গোয়েন্দা, পৃথিবীর ভয়ঙ্করতম কারাগার শাখালিন দেখার জন্যে যাত্রা করেছিলেন তিনি। একটা মানবাধিকার কল্যাণ সংস্থার অনুরোধে, তাদের খরচে এসেছিলেন এখানে। শাখালিনে এখনও অমানবিক, ভয়াবহ অত্যাচার চলে বন্দিদের ওপর—এটা গোপনে দেখে যাওয়ার জন্যে। উদ্দেশ্য ছিল, প্রতিবেদন লিখে কর্তৃপক্ষের শয়তানির খবর ফাঁস করে দেবেন পৃথিবীবাসীর কাছে। প্রতিকারের আবেদন জানাবেন।

নিরাপদেই জাপান পৌঁছেছিলেন তিনি। উত্তর সীমান্তের অখ্যাত একটা এয়ার পোর্ট থেকে বিমান ভাড়া করেন শাখালিনে আসার জন্যে। পাইলট ছিল এক জাপানী, নাম মিকোশা ওয়াসাকি। জাপান থেকে রওনা দেয়ার পর বিমান সহ নিখোঁজ হয়ে গেল দুজনে।

মাস তিনেক আগে রকি বীচের বিখ্যাত গোয়েন্দা ভিকটর সাইমনের সহায়তায় নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানতে পেরেছে তিন গোয়েন্দা, শাখালিন কারাগারে আটকে আছেন মিস্টার মিলফোর্ড। সঙ্গে সঙ্গে মনস্থির করে ফেলল রবিন, বাবাকে মুক্ত করে আনতে যাবে। বলা বাহুল্য, তাকে সাহায্য করতে, তার সঙ্গে আসতে রাজি হয়ে গেল কিশোর, মুসা আর ওমর।

চঞ্চল হয়ে চতুর্দিকে ঘুরছে ওমরের চোখ। ল্যান্ড করবে কোথায়, সেটাই এখন প্রধান সমস্যা। সামান্যতম ভুলও মারাত্মক বিপদ ডেকে আনতে পারে। প্রাণ যেতে পারে, কিংবা চিরতরে রুদ্ধ হয়ে যেতে পারে বাড়ি ফেরার পথ।

তাতার প্রণালীর শক্ত বরফে নামার চেষ্টা করা যেতে পারে। কিংবা দ্বীপের উল্টো দিকের কোন খাঁড়ি বা নদীতে। খোলা সাগরে নামার কথা কল্পনায় আনাও ঠিক হবে না, কারণ সী অভ অখোটস্ক সব সময়ই ভয়ানক উত্তাল থাকে। তাতার প্রণালীর বরফ নামার মত শক্ত আছে কিনা, বোঝার উপায় নেই।

রাতের বেলা। যদি নিরাপদে নামা সম্ভবও হয়, ঠিক জায়গায় নামল কিনা সেটাও বুঝতে হবে। হয়তো ভুল জায়গায় নেমে বসল, জেলখানা যেখান থেকে অনেক দূর। হেঁটে পৌঁছা তখন অসম্ভব হয়ে দাঁড়াতে পারে। খাঁড়ি আর নদীর প্রকৃত অবস্থাও জানা নেই। পাথুরে বোঝাই প্রান্তর বা অন্য কোন ধরনের প্রতিবন্ধকতাও থাকতে পারে। দিনে হলে এ সব দেখা অনেক সহজ হত, কিন্তু দিনের বেলা প্রহরীদের ভয় আছে। তাদের নজর এড়িয়ে কোনমতেই ল্যান্ড করা সম্ভব না।

সমস্যা আরও আছে। শুনে এসেছে জেলখানাটা দ্বীপের যে দিকে, সে-পাশটায় গোটা তিনেক খাঁড়ি আছে। নদীর মোহনা আছে। আন্দাজে সে-সব জায়গায় নামানোর চেষ্টা করা যেতে পারে। নামতে গিয়ে যদি দুর্ঘটনা থেকে ভাগ্যক্রমে

বেঁচেও যায়, দেখা দেবে প্লেন লুকানোর সমস্যা।

লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে গেছে মার্লিন। সবাই চুপ। কিন্তু নামানোর সাহস করতে পারল না ওমর। আবার ফিরে গেল সাগরের ওপর। এ সব ঘোরাঘুরিরও বিপদ আছে। রাডারের পর্দায় কেউ চোখ রেখে থাকলে দেখে ফেলবে।

গতি কমাল ওমর। এক ধাপ কমে গেল ইঞ্জিনের শব্দ। মাটির বুকে লম্বা কালো দাগের মত একটা জায়গার দিকে এগিয়ে গেল। বিমান যতই নামছে, ধীরে, অতি ধীরে একটা বিশেষ রূপ নিচ্ছে দাগটা। দশ হাজার ফুট ওপরে থাকতে যতটা পারল ইঞ্জিনের শব্দ কমিয়ে দিল ওমর। কাত করে দিয়েছে বাঁ-দিকের ডানা। তাতে দ্রুত নামা সম্ভব হচ্ছে। কথা নেই মুখে। তাকিয়ে আছে এগোতে থাকা বিষণ্ন অন্ধকারে ঢাকা ভূমিটার দিকে।

নদীর মোহনাটা খুঁজে বেড়াচ্ছে তার চোখ, ছবিতে যেটা দেখে এসেছে। এখন জোয়ারের সময়। সঠিক জায়গায় নামতে পারলে স্রোতই তীরে ঠেলে নিয়ে যাবে ওদের, ইঞ্জিন চালু করা লাগবে না। ছবিতে আরও দেখেছে, উজানের দিকে ছড়ানো ছিটানো কিছু কুঁড়ে আছে। লোক আছে কিনা ওগুলোতে, থাকলে কারা, ছবি দেখে সেটা জানা যায়নি।

নদীর পাড়ে পৌঁছানোটাই সমস্যার সমাধান নয়। জঙ্গল না থেকে যদি খোলা বালির চরা হয় তাহলে লাভ নেই, প্লেন লুকানোর জায়গা পাবে না। খোলা জায়গায় রেখে দিয়ে, কারও চোখে পড়বে না—এটা ভাবাটাও বোকামি। পাহাড়ের দেয়াল যদি থাকে, আর তার মধ্যে বড় ধরনের ফাটল, ফাঁক-ফোকর বা খাঁজ, যার মধ্যে পানি ঢুকে গেছে, তাহলে সুবিধে হয়। ভেতরে ঢুকিয়ে লুকিয়ে রাখা যায়। কিন্তু আছে কিনা অন্ধকারে এত ওপর থেকে বোঝা যাচ্ছে না। ঝুঁকি নিতে হবে, নামতে হবে ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে, আর কোন উপায় নেই।

মুসা জানিয়ে গেল, বাতাস প্রায় নেই।

নেমেই চলেছে বিমান। এক হাজার ফুট ওপর থেকে নিচের দৃশ্য অনেকটা স্পষ্ট হলো, যদিও সব কিছু নিখুঁত ভাবে বোঝা যাচ্ছে না এখনও। উত্তেজনায় টানটান হয়ে আছে ওমরের স্নায়ু।

কিশোর তাকিয়ে আছে মোহনার দিকে। অনেক চওড়া। ততটা আশা করেনি। জোয়ারের কারণে ঢালু জায়গাগুলোতে পানি উঠে যাওয়াতে বোধহয় এ রকম লাগছে। উজানের দিকে নদী অনেক সরু।

ঈগলের মত ডানা মেলে, যতটা সম্ভব নিঃশব্দে গ্লাইড করে চলেছে এখন বিমান। সব আলো নিভিয়ে দিয়েছে ওমর।

জিভ দিয়ে ঠোঁট ভেজাল কিশোর। উদ্বেগ উত্তেজনায় বার বার শুকিয়ে যাচ্ছে। আসল সময় উপস্থিত। পরের দু'তিন মিনিটেই ভাগ্য নির্ধারণ হয়ে যাবে ওদের। হয় বসে পড়বে বিমান, নয়তো নিরাপদ অবতরণ। কালো পানিতে তারার প্রতিবিম্ব। বাতাস নেই। তাই ঢেউও নেই। পানি শান্ত।

কন্ট্রোল কলামটা সামনে ঠেলে দিল ওমর। ঝপাং করে পানিতে আঘাত হানল বিমানের তলা। বার দুই ওঠা-নামা করে ঝাঁকি খেল, কয়লা-কালো তটরেখা বরাবর ছুটে গেল পঞ্চাশ-ষাট গজ।

সুইচ অফ করে দিল ওমর। অকস্মাৎ নীরবতা যেন গ্রাস করে ফেলল ওদের। ঠাণ্ডা, ভোঁতা, ভয়ানক নীরবতা।

ফুসফুসে চেপে রাখা বাতাস শব্দ তুলে বেরিয়ে গেল ওমরের নাক দিয়ে। 'যাক, নিরাপদেই নামলাম। মনে হচ্ছে প্লেনের কোন ক্ষতি হয়নি।'

দরজায় উঁকি দিল রবিন, 'বেঁচেই আছি মনে হচ্ছে।'

'হ্যাঁ। নদীর ওপরেই আছি এখনও, তলায় যাইনি,' জবাব দিল ওমর। 'ডিঙি নামাতে হবে। তীরের অবস্থা দেখা দরকার। আশা করছি স্রোতে ঠেলে কিনারে নিয়ে যাবে। না নিলে দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রাখতে হবে কোথাও। আমি বললে তারপর ডিঙি নামাবে। আগে শিওর হয়ে নিই, আমাদের ল্যান্ডিঙের খবর কেউ জেনে ফেলল কিনা।'

ওমরের সঙ্গে বিমানের পিঠে উঠল কিশোর। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে তীরের দিকে তাকাল। দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। কান খাড়া। কোন শব্দ নেই। মনে হচ্ছে ভুল করে কোন মরা গ্রহে নেমে পড়েছে। ঠাণ্ডা ও প্রচণ্ড। ধোঁয়া হয়ে যাচ্ছে নিঃশ্বাস।

কয়েক মিনিট দেখার পর ওমর বলল, 'স্রোতে ঠেলছে কিন্তু। কোথায় চলেছি দেখা যাক।'

বাতাসে ফোলানো রবারের ডিঙি নামানো হলো। কিশোর আর ওমর গেল দেখতে। দাঁড় বেয়ে এগোল। অদূরেই তীর। আট-দশ ফুট উঁচু নলখাগড়া জন্মে আছে অগভীর পানিতে। তীর আর পানির মাঝখানে বেড়া তৈরি করে রেখেছে।

সন্তুষ্ট হলো ওমর। 'এর মধ্যে লুকানো যাবে মনে হচ্ছে।'

মুখের কথা মুখেই রইল ওর, শোনা গেল ভয়ঙ্কর ফড়ফড় ফড়ফড় শব্দ। এতটাই চমকে গেল কিশোর, দাঁড় বাইতে বাইতে আরেকটু হলে পানিতে উল্টে পড়ে যাচ্ছিল। একটানা শব্দ হচ্ছে তো হচ্ছেই। থামাথামি নেই যেন আর।

আকাশ ঢেকে দিল বুনো হাঁসের বিশাল ঝাঁক।

ধীরে ধীরে কমে এল ডানা ঝাপটানোর শব্দ।

'নলখাগড়ার বনে বিশ্রাম করছিল,' ওমর বলল। 'রাত দুপুরে নৌকা দেখে ভড়কে গেলে ওদের দোষ দেয়া যায় না। আমাদেরই বা দোষ কি। আমরা কি আর জানি।'

'বাপরে বাপ, কি শব্দের শব্দ!' কাঁপা স্বর বেরোল কিশোরের কণ্ঠ থেকে। 'আমি তো ভাবলাম না জানি কি!'

'তবে যা-ই বলো, জ্বালাবে ওরা,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল ওমর। 'এখন চলে গেলেও আবার ফিরবে। ওদের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।...দাঁড় থামালে কেন? এগোও। আর মাত্র ঘণ্টাখানেক চাঁদের আলো পাব। এর মধ্যেই প্লেনটা লুকানোর ব্যবস্থা করতে হবে।'

তীর বরাবর নৌকা বেয়ে চলল ওরা। একপাশে নলখাগড়ার বেড়া। ভালমত দেখে বোঝা গেল, ভৌগোলিক কোন কারণে সরাসরি কিংবা তীরের সমান্তরালে এগোয়নি নলখাগড়ার বেড়া। কোথাও তীর থেকে নদীর একশো গজ ভেতরে চলে এসেছে, আবার কোথাও তীরের একেবারে গা ঘেঁষা; কোথাও ঘন, কোথাও পাতলা। পাতলা জায়গাগুলোতে কালো পানি দেখা যাচ্ছে।

ডাঙায় বড় বড় ফার গাছের জঙ্গল। পানির কিনার থেকে শুরু করে সারি দিয়ে দিয়ে চলে গেছে পাহাড়ের দিকে। গাছের মাথার জড়াজড়ি করে থাকা ডালগুলোকে লাগছে তরঙ্গায়িত ব্যাসল্টের চূড়ার মত। পানির কিনারে গজানো গাছের শেকড়ে ক্রমাগত চুমু খাচ্ছে যেন ছোট ছোট ঢেউ। কোথাও কোথাও ভেতরে ঢুকে গেছে সরু সরু প্রণালী, রহস্যময় সব ছোট ছোট ল্যাগুনে গিয়ে শেষ হয়েছে। প্রণালীর মুখের কাছে নলখাগড়া হয় একেবারেই নেই, নয়তো পাতলা।

'ওসব ল্যাগুনে প্লেন লুকানো সম্ভব,' ওমর বলল। 'যেটার মুখের কাছে নলখাগড়া বেশি, সেটা হলেই ভাল। অবশ্য তাতে সুবিধে যেমন আছে, অসুবিধেও আছে। সুবিধে হলো, নলখাগড়ার আড়ালে থাকায় নদীতে চলাচলকারী নৌকার চোখে পড়বে না। আর অসুবিধে, ঢোকানোর সময় ডানায় লেগে, পেটের চাপে নলখাগড়ার ডাঁটা ভাঙবে; সেটাও চোখে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। তবে সরাসরি প্লেনটা দেখানোর চেয়ে ডাঁটি ভাঙার ঝুঁকি নেয়াই ভাল। চেষ্টা করতে হবে, যতটা সম্ভব কম ভেঙে ভেতরে ঢোকানোর। দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে আসব। ল্যাগুনে ঢোকানোর পর মুখটা ঘুরিয়ে রাখব নদীর দিকে, যাতে প্রয়োজনের সময় মুহূর্তে সহজে বের করে নিয়ে যাওয়া যায়।'

দেখা হয়েছে। ফিরে চলল ওরা।

কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'ওমর ভাই, জেলখানাটা কত দূরে, অনুমান করতে পারেন?'

'সরাসরি গেলে তিন কি চার মাইল।'

বিমানের গায়ে ডিঙি ভেড়াল ওরা।

'বাপরে বাপ, কি শব্দ!' দরজায় দাঁড়িয়ে ওদের স্বাগত জানাল মুসা। 'আমরা তো ভাবলাম জলহস্তীর কবলে পড়েছ।'

'হাতি আকাশে ওড়ে না,' গম্ভীর স্বরে জবাব দিল কিশোর।

'কি জানি, কোন দেশের কি কাণ্ড! হাঁসে বলে এমন শব্দ করে! যা কাণ্ডকারখানা দেখছি এখানে, হাতি উড়াল দিলেও অবাক হব না।'

'তোমার তো যত সব উদ্ভট চিন্তা,' ওমর বলল। 'কথা বাদ দিয়ে হাত লাগাও। সময় নেই। ভোর হয়ে যাচ্ছে।'

'ইস্, যা ভয়ানক ঠাণ্ডা,' বিড়বিড় করল রবিন।

'কাজ করলেই গা গরম হয়ে যাবে।'

বিমানের লেজে দড়ি বেঁধে প্রথমে টেনে নিয়ে আসা হলো একটা সরু খালের কাছে। ল্যাগুনে ঢোকার মুখ ওটা। নলখাগড়ায় ছেয়ে আছে। ঢোকানো সহজ হলো না মোটেও। ওমর চেয়েছিল, নলখাগড়া যেমন আছে তেমন রেখে ঢোকাতে। পারল না। ছুরি দিয়ে কেটে শেষে পথ করে নিতে হলো। সাবধানে কাটল, পানির নিচে থেকে। ওপরে কাটলে সহজেই চোখে পড়বে। ঠাণ্ডা পানিতে হাত চোবাতে চোবাতে অবশ হয়ে গেল। কাটা নলখাগড়াগুলো অবশ্য কাজে লাগল। প্লেনটা ল্যাগুনে ঢোকানোর পর সেগুলো ওপরে ছড়িয়ে দিয়ে বিমানটা ঢেকে দিল তিন গোয়েন্দা।

এত সাবধানতা কেন, জানতে চাইল মুসা।

'আকাশ থেকে দেখা যাওয়ার ভয়ে,' ওমর বলল। 'এয়ার পেট্রল নিশ্চয় আছে। ওপর থেকে অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়লে দেখতে নামবে। আর নামলে গেলাম।'

আরও কিছু নলখাগড়া কেটে পুরোপুরি ঢেকে দেয়া হলো বিমানটা। ডিঙিটা বেঁধে রাখা হলো তার সঙ্গে। ওটাকেও ঢেকে দেয়া হলো নলখাগড়া দিয়ে। পাখিগুলোকেও ভয় পাচ্ছে ওমর। তার ধারণা, ভাটার সময় ওগুলো ফিরে আসবে। খাবার খুঁজতে গিয়ে সরিয়ে দেবে আলগাভাবে ফেলে রাখা ডাঁটাগুলো।

'আরও নানা ভাবে জ্বালাবে ওগুলো,' বলল সে। 'আমাদের দেখলেই দল বেঁধে উড়াল দেবে। দূর থেকে কারও নজরে পড়লে, কোন কিছু চমকে দিয়েছে ওদের সন্দেহ হলে দেখতে আসবে। প্লেন নিয়ে উড়তে গেলেও বিপদ বাধাবে ওই পাখি। বড় বড় হাঁস আছে ঝাঁকে। ঘাবড়ে গিয়ে উল্টোপাল্টা উড়ে প্লেনের গায়ে এসে বাড়ি খেলে মারাত্মক বিপদ হবে। যাই হোক, আপাতত ওসব চিন্তা করে লাভ নেই। এসো, কিছু খেয়ে নেয়া যাক।'

'তীরে নামবেন নাকি আজ?' জানতে চাইল রবিন।

'ইচ্ছে তো আছে। দেখা যাক। বসে বসে এখন দেখব কিছু ঘটে নাকি। আমাদের আগমন কারও চোখে পড়েছে কিনা সেটাও বুঝতে পারব। চোখে পড়লে দেখতে আসবে।'

নাস্তার পর গরম কফি নিয়ে বসল সবাই।

দশটার পর ওমরের সন্দেহ সত্যে পরিণত হলো।

'ওই যে, নৌকা আসছে,' কিশোর জানাল। 'দুটো নৌকা। নদী দিয়ে আসছে।'

মোহনার দিকে চলেছে নৌকা দুটো। উদ্বিগ্ন হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল ওরা। দুশ্চিন্তা কাটল নৌকা দুটোকে পাল তুলতে দেখে। খোলা সাগরের দিকে যাচ্ছে।

'নাহ্, আমাদের খুঁজতে আসেনি,' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর। 'জেলে। মাছ ধরতে যাচ্ছে। নদীর উজানে যে বস্তি আছে, মনে হয় ওখান থেকে এসেছে।'

ফ্যাকাসে সূর্য দেখা দিল দিগন্তে। পর্বতের ঢালে গাছপালায় আটকে থাকা কুয়াশা হার মানতে বাধ্য হলো সেই নিস্তেজ সূর্যের কাছেই। ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মত গড়িয়ে গড়িয়ে সরে যেতে লাগল দূরে।

দুই

দুই ঘণ্টা পেরোল। অশান্তির আর কোন কারণ ঘটল না। মাঝে মাঝে বুনো হাঁসের ঝাঁক এসে নামছে। শব্দ হচ্ছে। পানি তোলপাড় করছে। তারপর আবার সব চুপ।

'ঝুঁকি নিয়েই তীরে নামতে হবে,' ওমর বলল।

'নিতে কোন আপত্তি নেই আমাদের,' কিশোর বলল। 'বিপদ হবে জেনেশুনেই এসেছি। আপনি প্লেনে থাকুন, পাহারা দিন, আমরা বরং তীরে নেমে আশপাশটা ঘুরে দেখে আসি।'

'যাও। তবে সাবধান। কারও চোখে পোড়ো না।'

ডিঙি নিয়ে রওনা হলো তিনবন্ধু। পানি বরফের মত ঠাণ্ডা। কোনভাবে তাতে

পড়ে গেলে ভোগান্তি আছে কপালে। নলখাগড়ার ফাঁক-ফোকর দিয়ে সাবধানে ডিঙি বেয়ে চলল মুসা। তীরের কাছে নরম কাদা। তার ওপর দিয়েই কোনমতে ঠেলেঠুলে নিয়ে আসা হলো ডিঙি। তীরে নামল ওরা। দড়ি দিয়ে গাছের সঙ্গে ডিঙিটা বেঁধে রাখল মুসা।

ফার গাছগুলোর ঝুলে পড়া ডালের নিচে যেন নীরবতার রাজত্ব। হাঁটতে গেলেও শব্দ হয় না। পুরু গদির মত বিছিয়ে আছে মরা পাতা আর ধূসর এক ধরনের শ্যাওলা। গায়ে গায়ে লেগে থাকা গাছের জন্যে দৃষ্টি বাধা পড়ে। ঠিকমত তাকানো যায় শুধু বনের প্রান্তে নলখাগড়ার বেড়া আর গাছের সীমানার মাঝখানে যে এক চিলতে খোলা লম্বা জায়গাটুকু আছে, সেখানে দাঁড়ালে। একটা বাদামী ভালুককে আসতে দেখা গেল সেখান দিয়ে। আড়ষ্ট হয়ে গেল ওরা। কিন্তু কোন উগ্রতা নেই ভালুকটার মাঝে, উত্তেজনা নেই, শান্তভাবে ওদের পাশ কাটিয়ে চলে গেল।

'মানুষের সঙ্গে এখানে বিশেষ শত্রুতা নেই ওদের,' কিশোর বলল। 'আমরা বিরক্ত না করলে আমাদেরও করবে না।'

বনের যেন শেষ নেই। যেখানে দাঁড়িয়ে আছে; সেখান থেকে যেদিকেই তাকাচ্ছে শুধু বন আর বন। ধোঁয়া নেই। মানুষ বসবাসের কোন চিহ্নই নেই।

এতটা একঘেয়ে, বিবর্ণ, বিষণ্ণ প্রকৃতি আর দেখেনি কিশোর। যেন কি এক বিয়োগান্ত নাটক ঘটে গেছে এখানে। মানুষের দুর্দশা দেখে দেখে যেন প্রকৃতির মন খারাপ। সে-জন্যেই গাছগুলো লজ্জায় ডাল নুইয়ে রাখে সারাক্ষণ। সব কিছুতেই বিপদের ছায়া।

পর্বতের চূড়াগুলোয় শীতকালের শক্ত সাদা বরফ এখনও গলেনি।

'এ কি জায়গারে বাবা!' না বলে পারল না মুসা। 'কবরে ঢুকলাম নাকি?'

একমত হলো রবিন। 'গাছগুলোর দিকে তাকালেই গায়ে কাঁটা দিচ্ছে আমার।'

'মনে হচ্ছে, আড়াল থেকে কে যেন চোখ রাখছে আমাদের ওপর।'

কিশোরের দিকে তাকাল মুসা। 'আর এগোব?'

'আসল জিনিসটাই তো দেখলাম না এখনও, জেলখানা,' রবিন বলল। 'চলো দেখে আসি।'

নদী ধরে উজানের দিকে এগোতে হবে, জানা আছে ওদের। খোঁজ-খবর যতটা যা পেরেছে নিয়েই এসেছে। নদীর উজানে একটা উঁচু জায়গার ওপর বন-জঙ্গল পরিষ্কার করে তৈরি করা হয়েছে জেলখানাটা।

'এসেই এত তাড়াতাড়ি কারও চোখে পড়তে চাই না,' কিশোর বলল।

'চোখে পড়ব কেন? মানুষের আনাগোনা দেখলেই বনে ঢুকে যাব।'

মুসাও রবিনের সঙ্গে একমত। বলল, 'কোন না কোন সময় তো যেতেই হবে। এলামই সে-জন্যে। এখন গেলে অসুবিধে কি?'

দ্বিধা করতে লাগল কিশোর।

'উফ্, দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে জমে গেলাম!' তাগাদা দিল মুসা, 'যা হোক একটা কিছু করো। হাঁটলে শরীর গরম হবে।'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও যেন রাজি হলো কিশোর, 'ঠিক আছে, চলো। সামনে যতটা পারি এগোই। কি আছে দেখে নেয়া যাক। তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা। পারলে যাব

জেলখানার কাছে, না পারলে নেই।'

বনের কিনারের সেই এক চিলতে ফাঁকা জায়গাটা ধরে এগিয়ে চলল ওরা। খানিক গিয়ে বোঝা গেল এটা পায়েচলা পথ। নিয়মিত জন্তু-জানোয়ার চলাচল করে। মানুষ চলার চিহ্ন নেই। মাটিতে কোথাও একটা জুতোর ছাপও চোখে পড়ল না। হরিণের খুরের দাগ আছে, আছে ভালুকের পায়ের ছাপ। আরেক ধরনের খুরের দাগ আছে, খুব কম। চেনা চেনা লাগল মুসার। চিনে ফেলল হঠাৎ, 'ঘোড়া!'

ঘোড়া মানেই মানুষ!

হয়তো ঘোড়ার পিঠে চেপে টহল দিতে আসে এদিকে জেলখানার প্রহরী।

দাঁড়িয়ে গেল কিশোর। সামনে একটা বাঁক। সেদিকে তাকিয়ে বলল, 'এ ভাবে খোলা জায়গা দিয়ে এগোনো বোধহয় আর ঠিক হবে না।'

'মানুষের সাড়া তো এখনও পাওয়া যায়নি,' রবিন বলল। 'চলো, বাঁকের ওপাশে গিয়ে দেখি, কি দেখা যায়।'

দ্বিধা করে আবার পা বাড়াল কিশোর। দেখার ইচ্ছে তারও কম না। কিন্তু মোড়ের কাছে যাওয়ার আগেই আবার থমকে দাঁড়াতে হলো।

তীক্ষ্ণ একটা শব্দ! ঠাস করে উঠল। নীরবতার মাঝে স্পষ্ট শোনা গেল। রাইফেলের গুলির মত, কিন্তু গুলি নয়।

চোখের পলকে রাস্তা থেকে সরে গিয়ে বনে ঢুকে পড়ল তিনজন।

'কিসের শব্দ?' ফিসফিস করে বলল মুসা। 'বাড়ি মারার মত মনে হলো।'

কিশোর বলল, 'চলো দেখে আসি।'

গাছের আড়ালে আড়ালে খুব সাবধানে এগোল ওরা। দেখতে পেল লোকটাকে। ছোট্ট একটা ফাঁকা জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। হাত থেকে ফেলে দিল লাঠির মত একটা খাটো ডাল। মাটিতে তার পায়ের কাছে পড়ে আছে দুটো মরা সেবল। খানিক দূরে একটা মরা শেয়াল। বোঝা গেল, ফাঁদে আটকা পড়েছিল। লাঠি দিয়ে পিটিয়ে মারা হয়েছে ওগুলোকে। ঠাস করে শব্দটা হয়েছিল হাড় ভাঙার।

মৃত জানোয়ারের চেয়ে লোকটার প্রতি কিশোরের আগ্রহ বেশি। ভাবভঙ্গি, আচরণে মানুষের চেয়ে জানোয়ারের সঙ্গেই মিল বেশি। কাদা লাগা, ময়লা পোশাকটা দেখে বোঝা কঠিন তাতে কাপড়ের পরিমাণ বেশি, নাকি জানোয়ারের চামড়া। শুকনো, খটখটে দেহটাকে জড়িয়ে রেখেছে বিচিত্র ওই পোশাক। কোমরে একটা কুড়াল ঝুলছে। বহু বছরের না-কাটা চুল-দাড়িতে সাদা ছোপ। গোঁফ-দাড়িতে ঢাকা মুখের খুব সামান্যই চোখে পড়ে।

কিশোরের অনুমান, বয়েস অন্তত ষাট বছর হবে লোকটার। তবে বয়েসের তুলনায় অনেক বেশি কর্মক্ষম। কুড়ালটা ছাড়া আর কোন অস্ত্র নেই তার কাছে।

চারদিকে শেয়ালের মত একবার সতর্ক দৃষ্টি বুলিয়ে মরা জানোয়ারগুলোকে কাঁধে তুলে নিল সে। লম্বা লম্বা পা ফেলে চলে গেল গাছের আড়ালে।

'শিকারী,' ফিসফিস করে বলল রবিন।

'শিকারীই, তবে ট্র্যাপার,' মুসা বলল। 'ফাঁদ দিয়ে জানোয়ার ধরে। ভোঁদড় দুটো দেখলে না।'

'ওগুলো সেবল।'

'তাই নাকি। সেবলের চামড়া তো শুনেছি খুব দামী।'

'ঠিকই শুনেছ।'

'এ বনে ট্র্যাপার আছে যখন,' কিশোর বলল, 'চলাফেরায় আরও সাবধান হতে হবে আমাদের।'

'দেখে ফেলবে বলে?' মুসার প্রশ্ন।

'সে তো বটেই। তা ছাড়া ফাঁদের কথাটা ভুললে চলবে না। ফাঁদ পেতে রাখে। ভালুকের ফাঁদে পা দিয়ে বসলে কি ঘটবে ভাবো।'

'কিন্তু কে লোকটা? কয়েদী হলে তো জেলে থাকত।'

'পিছে পিছে গিয়ে দেখলেই তো পারি কোথায় যায়,' রবিন বলল। 'কাছাকাছি ঘরবাড়ি থাকতে পারে।'

লোকটার পদচিহ্ন অনুসরণ করে এগিয়ে চলল ওরা। মুখের কাছে পড়ছে গাছের ডাল। খুব সাবধানে দু'হাতে সরাতে লাগল ওগুলো, যাতে কোন রকম শব্দ না হয়। চলতে চলতে বনের কিনারে চলে এল। গাছের বাকল আর সীলের চামড়া দিয়ে বানানো অতি সাধারণ একটা নৌকা দেখতে পেল নদীর ধারে। কাদায় টেনে তুলে রাখা হয়েছে। ওরা ভেবেছিল নৌকায় উঠবে লোকটা। কিন্তু বন থেকে বেরোলও না, নৌকায়ও উঠল না। নদী একপাশে রেখে বনের কিনার ধরে এগিয়ে চলল আবার। নাকে এল অতি আকাঙ্ক্ষিত ধোঁয়ার গন্ধ।

এক ঢিলতে ফাঁকা জায়গায় গাছের খুঁটি আর তক্তার বেড়া দিয়ে কোনমতে খাড়া করা হয়েছে একটা কুঁড়ে। এতই করুণ চেহারার, তাতে যে মানুষ কিভাবে বাস করতে পারে সেটাই কল্পনার বিষয়। কিন্তু বাস যে করে, চোখেই দেখা গেল। লোকটা ঘরের দিকে এগোতেই সাড়া পেয়ে নিচু একটা ঝাঁপ খুলে বেরিয়ে এল এক মহিলা। ছালা আর নেকড়ায় তৈরি পোশাকের অবস্থা দেখে কাকতাড়ুয়াও লজ্জা পাবে। খুব অসুস্থ মনে হলো মহিলাকে। দরজায় হেলান দিয়ে কাশতে শুরু করল। ভয়ানক কাশি আর থামেই না। নিজের অজান্তেই চোখ-মুখ কুঁচকে গেল কিশোরের। পাঁচ-ছয় বছরের একটা ছোট্ট ছেলে দৌড়ে বেরিয়ে এসে মহিলাকে জড়িয়ে ধরে আরাম দেয়ার চেষ্টা করল।

শুকানোর জন্যে ঘরের বেড়ায় ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে একটা ভালুকের চামড়া। গাছের ডালে দড়ি বেঁধে গুটকি করার জন্যে মাছ ঝোলানো হয়েছে। এই তাজা আবহাওয়ায়, সূর্যের তাপে কবে ওগুলো শুকাবে, আর কবে গুটকি হবে, ভাবতে অবাক লাগল কিশোরের। গাছের আড়ালে লুকিয়ে থেকে দেখছে ওরা।

যা দেখার দেখে নিয়ে ফেরার জন্যে ঘুরতে যাবে কিশোর, কানে এল ঘোড়ার খুরের শব্দ। দাঁড়িয়ে গেল আবার।

কুঁড়ের পেছনের বন থেকে বেরিয়ে এল তিনজন অশ্বারোহী। একজন আগে, বাকি দুজন পেছনে। ইউনিফর্ম দেখে বোঝা গেল সামনের লোকটা ওদের সর্দার। মাথায় কালো রোমশ গোল টুপি। চ্যাপ্টা মুখ, ভুরু কুঁচকে যেন লেগেই আছে। হাতে চাবুক। কোমরের হোলস্টারে রিভলভার। বুকের একপাশে ঝোলানো গুলির বেল্ট।

'কসাক,' ফিসফিস করে বলল রবিন।

লোকগুলোকে দেখে প্রথমেই মনে হলো কিশোরের, ওদের আসার খবরটা

জেনে গেছে। তাই শিকারীকে জিজ্ঞেস করতে এসেছে প্রেনটা দেখেছে কিনা।

লোকগুলোকে দেখেই কুঁকড়ে গেল শিকারী আর তার স্ত্রী। ঘোড়া থেকে নামল সর্দার। চাবুকটা ছুঁড়ে দিল এক সহকারীর দিকে। কর্কশ কণ্ঠে কিছু জিজ্ঞেস করল। বুট তুলে লাথি মেরে মাটিতে ফেলে দিল ছেলেটাকে। চিৎকার করে কাঁদারও সাহস করল না ছেলেটা। নীরবে ফোঁপাতে লাগল। চোখে পানি। অসহায় ভঙ্গিতে তাকিয়ে রইল তার বাবা-মা। কিছু করল না।

রাগ দমন করতে পারল না মুসা। আগে বাড়তে গেল। খপ করে তার হাত ধরে ফেলল কিশোর। কানে কানে বলল, 'খামো। পাগলামি কোরো না।'

পরের কয়েক মিনিটে যা ঘটল নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না সে। মানুষগুলোকে অনবরত প্রশ্ন করে গেল লোকটা। তারপর তার সহকারীর হাত থেকে চাবুকটা নিয়ে ইচ্ছে মত পেটাতে লাগল শিকারী আর তার অসুস্থ স্ত্রীকে। তারপর ঘোড়ায় চেপে চলে গেল যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে। মার খাওয়া কুকুরের মত কাঁপতে কাঁপতে ছেলেটাকে নিয়ে ঘরে ঢুকে গেল মহিলা। শিকারী গেল তার পেছন পেছন।

জোরে নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর। 'নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাসই করতাম না,' বিড়বিড় করল সে। রবিনের দিকে তাকাল, 'রাশান ভাষায় কথা বলল নাকি?'

মাথা ঝাঁকাল রবিন। বাবাকে উদ্ধার করতে শাখালিনে আসতে হবে, এটা জেনে কাজ চালানোর মত রাশান ভাষা শিখে নিয়েছে সে।

'কি বলল, কিছু বুঝতে পেরেছ?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'সেবলগুলো কাউকে না দিতে শাসিয়ে গেল।'

'এখন নিল না কেন?'

'সেটা কিছু বলেনি।'

'উফ্, কি জীবন! আর বাস করার কি জায়গা!'

'হ্যাঁ! চলো, যাই।'

'দাঁড়াও, একটা বুদ্ধি এসেছে মাথায়।'

কিশোরের দিকে তাকাল রবিন, 'কি বুদ্ধি?'

'বেচারা এই লোকগুলো নিশ্চয় সৈনাদের ঘৃণা করে।'

'যে ব্যবহার করে গেল, না করার কোন কারণ নেই। কিন্তু তাতে কি?'

'আমাদের সাহায্য করতে রাজি হবে।'

'তুমি বলতে চাইছ···প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে?'

'হ্যাঁ।'

'আতঙ্কে হুঁশ-জ্ঞান ঠিক আছে কিনা ওদের কে জানে। দেখা দেয়াটা বিপজ্জনক হয়ে যাবে না?'

'ঝুঁকি নিতেই হবে। ওরা অনেক কিছু জানাতে পারবে আমাদের। তাতে আমাদের সময় আর ঝামেলা বাঁচবে অনেক।'

দ্বিধা কাটাতে পারছে না রবিন। তবে কিশোরের কথা যুক্তিসঙ্গত মনে হলো।

'বেশ, যাচ্ছি আমি কথা বলতে। কি জিজ্ঞেস করব?'

'জেলখানার কথা জিজ্ঞেস করবে। যতটা পারো তথ্য আদায় করবে। প্রশ্ন

করবে বেশি, জবাব দেবে কম। আমাদের সম্পর্কে যত কম জানাবে, ততই ভাল।

মাথা ঝাঁকাল রবিন। 'তুমি কি করবে?'

'আমি আর মুসা এখানেই আছি। এখুনি দেখা দেব না। আগে অবস্থা বুঝে দেখি।'

'ঠিক আছে। যাচ্ছি।'

'বিপদের সামান্যতম সম্ভাবনা দেখলেই দৌড় মারবে। পেছন ফিরে তাকাবে না আর।'

দরজার দিকে এগিয়ে গেল রবিন।

মুসাকে নিয়ে আরেকটু পিছিয়ে গেল কিশোর। একটা গাছের শেকড়ে বসে তাকিয়ে রইল। রবিনকে দরজায় টোকা দিতে দেখল। দরজা খুলল। ভেতরে ঢুকল রবিন। দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

আধঘণ্টা পর আবার খুলে গেল দরজা। হাসিমুখে রবিনকে বেরিয়ে আসতে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর। ওর গাছটার পাশ দিয়ে হেঁটে পার হয়ে গেল সে। কুঁড়ের কাছ থেকে বেশ কিছুটা সরে গিয়ে থামল।

কিশোর কাছে এলে বলল, 'ওদেরকে ভয় করার কিছু নেই।'

'জেনেছ নাকি?'

'অনেক। এখানেই বলব? নাকি প্লেনে গিয়ে সবার সামনে?'

'এখনই বলো।...এই যে, এই গাছটার ওপর বসি।' মাটিতে পড়ে থাকা একটা গাছের ওপর বসল কিশোর। 'হ্যাঁ, এবার বলো।'

'ওরা রাশান,' রবিন বলল। 'লোকটার নাম মিখাইল মারকভ। আর মহিলা মারশা মারকভ। লোকটা কৃষক। ভ্লাডিভোস্টকের কাছে প্রচুর জমিজমা ছিল ওদের। বারো বছর আগে একদিন ঝড়ে নৌকাডুবি হওয়া কয়েকজন জাপানী জেলেকে আশ্রয় দিয়েছিল ওরা, খাবার দিয়েছিল। নিতান্ত মানবিক কারণেই কাজটা করেছিল ওরা। কিন্তু পুলিশে ধরল ওদের। শত্রুদেশের নাগরিকদের আশ্রয় দেয়ার 'অপরাধে' অভিযোগ আনল। বলল, জাপানীগুলো সীল শিকারী। মারকভ বলল, সীল শিকারী হলেও সে কিছুই জানে না। কিন্তু বাঁচতে পারল না। তাকে আর তার স্ত্রীকে ধরে দশ বছরের জেল দিয়ে পাঠিয়ে দিল শাখালিন কারাগারে।'

'খাইছে!' চোখ বড় বড় হয়ে গেছে মুসার। 'এটুকু অপরাধের জন্যে দশ বছর!'

মারকভ বলল, ওদের ভাগ্য ভাল, মৃত্যুদণ্ড এড়াতে পেরেছে। বাড়তি শাস্তি হিসেবে সারা জীবনের জন্যে জেলের বাইরে এই জঙ্গলে আটকে থাকার দণ্ড দেয়া হয়েছে ওদের। শাখালিনে একবার যাদের পাঠানো হয়, তাদের আর দেশে ফিরে যাওয়ার ভাগ্য হয় না। মারকভদের আটকে রেখেছে দেশে ফিরে গিয়ে যাতে আর সম্পত্তি দাবি করতে না পারে ওরা।'

'তাহলে ওরা এখন দণ্ড ভোগ করছে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

হ্যাঁ।

'তারমানে জেলখানাটা সম্পর্কে সব জানে ওরা?'

'জানে। জেল খাটার মেয়াদ শেষ হলে বের করে দেয়া হয় ওদের। কিন্তু বলে দেয়া হয় শাখালিন ত্যাগ করতে পারবে না। জেলখানা থেকে বেরিয়ে নিজেদের

দায়িত্ব নিজেদের নিতে হবে। মরল কি বাঁচল, কর্তৃপক্ষ দেখতে আসবে না। কিন্তু যেতে পারবে না কোনখানে। ওই কুঁড়েটা বানিয়ে নিয়েছে ওরা। মাছ ধরে আর শিকার করে দিন চলে। জীবনের বাকি দিনগুলো এ ভাবেই কাটাতে হবে। ছেলেটার নাম শাসা, ওদের নিজের সন্তান নয়। নদীর উজানে আরেকটা কুঁড়েতে বাস করত ওর বাবা-মা। দুজনেই মারা গেলে মারকভরা নিয়ে এসেছে ওকে।'

'সৈন্যরা এসে পিটিয়ে গেল কেন?'

'জেলখানা থেকে বের করে দিলেও শান্তিতে থাকতে দেয়া হয় না ওদের। মাঝে মাঝেই এসে হানা দেয় জেলখানার লোক, দেখে যায় আছে নাকি ওরা। শুধু মারকভরাই নয়, ওদের মত মুক্তি পাওয়া কয়েদী আরও আছে, একই ভাবে পশুর জীবন যাপন করছে ওরাও,' এক মুহূর্ত থামল রবিন। 'যে লোকটা পিটিয়েছে ওদের, তার নাম লেফটেন্যান্ট খারগা। টহল দিতে বেরিয়েছে। মারকভের কপাল খারাপ। খারগা এসে দেখে ফেলেছে সেবল দুটো। মারকভ জানত খারগা দেখলেই কেড়ে নিতে চাইবে। সময় পেলে লুকিয়ে ফেলত। সাংঘাতিক খারাপ লোক খারগা। আগে চোর ছিল। চুরির অপরাধেই তাকে পাঠানো হয়েছিল এখানে। এখন অফিসার সেজে বসেছে।'

'সে যা করে গেল, কর্তৃপক্ষ কি সেটা মেনে নেবে?'

'ওরা জানতেই পারবে না। অভিযোগ করারও সাহস হবে না মারকভের। ও বলেছে, ওর স্ত্রী মারা গেলে খুন করবে খারগাকে।'

'মারা যাবে নাকি?'

'হ্যাঁ। যক্ষ্মায় ভুগছে। যে কোন মুহূর্তে মারা যেতে পারে। আমি যতক্ষণ ছিলাম, একটিবারের জন্যে কাশি বন্ধ হয়নি।'

'খারগাকে খুন করলে মারকভকে সোজা ফাঁসিতে ঝোলাবে ওরা।'

'ও বলেছে, মারশা মারা গেলে যা খুশি ঘটে ঘটুক, ও কেয়ার করে না। এখন কিছু করছে না শুধু স্ত্রীকে খাবার জোগানোর জন্যে, যতটাই পারে।'

'বেচারারা! কিন্তু তুমি মনে হচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি ওদের আস্থা অর্জন করে ফেলেছ। কি করে সম্ভব হলো?'

'কেন এসেছি, সেটা বলে দিয়েছি ওদের।'

'হায় হায়, বলতে গেলে কেন?'

আমার কথা শুনেই বুঝে গেল, আমি রাশান নই। কাজেই সত্যি কথাটা বলতেই হলো। বললাম, আমি আমেরিকান। আমার বাবাকে এখানে জেলে আটকে রেখেছে। ও যখন বুঝল ওর শত্রু আমাদেরও শত্রু, বাকি কাজটা সহজ হয়ে গেল। ও কথা দিয়েছে, আমাদের যে কোন ভাবে সাহায্য করতে রাজি।'

'বেইমানী করবে না তো?'

মাথা নাড়ল রবিন। 'না, করবে না। খারগার কথা বলার সময় ওর চোখে যে ঘৃণা দেখেছি, না দেখলে বুঝবে না। বেঁচে থাকার এখন একটাই উদ্দেশ্য ওর—প্রতিশোধ নেয়া।'

'জেলখানায় কি করে ঢুকতে হয়, জানে নিশ্চয়?'

'জানবে না, ছিলই তো ওই জেলে! ওহহো, বলতে ভুলে গেছি, কয়েক দিন

আগেও নাকি একটা গুজব শুনেছে, একজন আমেরিকান এসেছে এখানে। সঙ্গে একজন জাপানী। প্লেন নিয়ে নাকি এসেছিল ওরা।'

'তারমানে মিলফোর্ড আঙ্কেল আর মিকোশা!' উত্তেজিত হয়ে উঠল মুসা।

মাথা ঝাঁকাল রবিন। 'তা ছাড়া আর কে? মিলে যাচ্ছে।'

'গুজবটা ছড়ায় কি করে?' জানতে চাইল কিশোর।

'করাত কলে আর কয়লা পাহাড়ে কাজ করাতে নিয়ে যায় কয়েদীদের, সেখান থেকেই খবরগুলো ফাঁস হয়।'

'কয়লা পাহাড়টা আবার কি জিনিস?' বুঝতে পারল না মুসা। 'কয়লার তৈরি পাহাড় নাকি?'

'অনেকটা ওরকমই,' রবিন বলল। 'পাহাড়ের মধ্যে কয়লা আছে এখানে। ঢালের গা থেকে মাটি সরে গিয়ে বেরিয়ে পড়েছে সেই কয়লা। সে-জন্যেই নাম হয়েছে কয়লা পাহাড়।'

'ভেরি গুড,' কিশোর বলল। 'একবারেই বহু খবর নিয়ে এসেছ। চলো, ওমর ভাইকে জানাইগে। অনেকক্ষণ হলো এসেছি। আমাদের দেরি দেখলে চিন্তা করবে।'

তিন

আধঘণ্টা পর বিমানের কেবিনে বসে আবার আলোচনা হলো বনের মধ্যে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো নিয়ে।

ওমর বলল, 'ভাল-মন্দ দুটোই হতে পারে এখন।'

'মন্দ কেন?' কিশোরের প্রশ্ন।

'মাথা গরম হয়ে গিয়ে এই মারকভ লোকটা সত্যি সত্যি যদি এখন খুন করে বসে খারগাকে, জেলখানা থেকে দলে দলে সৈন্য এসে হাজির হবে ওর খোঁজে। ওদের কেউ এদিকে চলে এলে দিনের আলোয় প্লেনটা দেখে ফেলবে।'

রবিন বলল, 'টহলদার বাহিনী এতদূর আসবে বলে মনে হয় না। মারকভ বলেছে, ওর বাড়িটাই শেষ বাড়ি।'

'খারগা খুন হয়ে গেলে ওরা কি করবে বলা যায় না।'

শঙ্কিত দৃষ্টিতে ওমরের দিকে তাকাল মুসা। 'তাহলে কি করা যায়?'

এক মুহূর্ত ভেবে নিল ওমর। 'সময় নষ্ট না করে এখনই গিয়ে মারকভের সঙ্গে আরেকবার দেখা করা দরকার। টহলদাররা মোহনার দিকে কতদূর পর্যন্ত আসে জিজ্ঞেস করতে হবে ওকে। এখানকার খবর নিশ্চয় সবই তার জানা। বের করে নিতে হবে সব। ও আমাদের দলে এলে বলতে আপত্তি করবে না।'

'খারগার ওপর প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে যে-দলে যেতে বলা হবে ওকে, সেই দলেই যাবে,' রবিন বলল। 'ওর আসলে হারানোর কিছু নেই আর এখন। খারগাকে খুন করার পর কি হবে ওর, সেটা নিয়ে ওর কোন চিন্তা নেই।'

'তাহলে চলো আবার, যাই। গিয়ে জিজ্ঞেস করে আসি। লোকটাকে আমার দেখতে ইচ্ছে করছে।'

'রবিন, কিছু খাবার নিয়ে যাও না,' কিশোর বলল। 'কনডেন্সড মিল্ক, বিস্কুট...'

'না, সেটা বোধহয় ঠিক হবে না,' ওমর বলল। 'বনের মধ্যে আমেরিকান কোম্পানির ছাপ মারা দুধের টিন কোন টহলদারের চোখে পড়ে গেলে বিপদ হবে।'

'মারকভকে সাবধান করে দিলেই হবে যাতে যেখানে সেখানে না ফেলে।'

'নাকি আরেক কাজ করব,' রবিন বলল। 'গিয়ে ওকে ডেকে নিয়ে আসব এখানে?'

'আপাতত ওর সঙ্গে গিয়ে দেখা করাটাই ভাল,' ওমর বলল। 'দ্রুত কিছু খেয়ে নিয়ে চলো বেরিয়ে পড়ি।' মুসা আর কিশোরকে বলল, 'আমি রবিনকে নিয়ে যাচ্ছি। তোমরা থাকো। ভাঙা নলখাগড়াগুলোর একটা ব্যবস্থা কোরো, যাতে সহজে চোখে না পড়ে। প্লেনটাকেও আরেকটু ভালমত ক্যামোফ্লেজ করো।'

খাওয়ার পর ডিঙিতে করে ওমর আর রবিনকে নামিয়ে দিয়ে এল মুসা। ওমর বলল, 'ফিরতে ঘণ্টা দুয়েকের বেশি লাগবে না আমাদের।'

মুসা ফিরে এলে তাকে নিয়ে কাজে লাগল কিশোর। খুব সাবধান রইল। সব সময় একটা চোখ রাখল তীরের দিকে। মাছ ধরতে যাওয়া নৌকা দুটোর ব্যাপারেও বেখেয়াল হলো না। দ্রুত কেটে গেল বিকেলটা। পর্বতের ওপাশে সূর্যটা হারিয়ে যেতেই মলিন হয়ে এল দিনের আলো। বাতাসের কনকনে ভাবটা ফিরে এল আবার।

'ওমর ভাই গেছে দুই ঘণ্টার বেশি হয়ে গেছে,' তোয়ালে দিয়ে হাত মুছতে মুছতে বলল কিশোর। কাজ করার সময় হাতে লেগে যাওয়া কাদা ধুয়ে এসেছে। 'কোন বিপদ হলো না তো?'

'কি জানি!' অনিশ্চিত ভঙ্গিতে জবাব দিল মুসা। 'এ ধরনের কাজে সময় লাগতেই পারে, দু'ঘণ্টা বললে যে দু'ঘণ্টার মধ্যেই ফিরে আসতে পারবে, তা জোর দিয়ে বলা যায় না।'

কিন্তু যখন আরও একটি ঘণ্টা পার হয়ে গেল, আঁধার নামল বনভূমিতে, দুশ্চিন্তা বেড়ে গেল ওদের। নিচের ঠোঁটে চিমটি কেটে বলল কিশোর, 'গোলমাল তো মনে হয় একটা সত্যি হয়েছে।'

ওর অনুমান ঠিক। প্ল্যান মাফিক হয়নি সব।

বিষণ্ণ বনের ভেতর দিয়ে ঠিকমতই কুঁড়েটার কাছে ওমরকে নিয়ে এসেছে রবিন। ঝাঁপটা লাগানো। কাউকে চোখে পড়ল না। নীরব। কেমন থমথম করছে জায়গাটা।

কুঁড়ের দিকে তাকিয়ে থেকে ওমর বলল, 'কিছু কি ঘটল নাকি?'

'ঝাঁপ লাগানো,' রবিন বলল। 'তারমানে ভেতরেই আছে ওরা।'

'গিয়ে দেখা দরকার। দাঁড়িয়ে থেকে অহেতুক সময় নষ্ট।'

সাবধানে পা টিপে টিপে এগোল ওরা। ঘুরে ঘুরে জানালাটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল ওমর। ভেতরে উঁকি দিল। কিন্তু এতই অন্ধকার, কিছু চোখে পড়ল না। দরজার সামনে এসে দাঁড়াল তখন। টোকা দিল।

সাড়া নেই।

আবার টোকা দিল সে।

একই অবস্থা।

রবিনের দিকে তাকাল একবার ওমর। অতি সাধারণ হুড়কোটা আস্তে করে আঙুল দিয়ে ঠেলে তুলল ওপর দিকে। ঠেলা দিল দরজায়।

ফাঁক হয়ে যাওয়া দরজা দিয়ে এখন আলো ঢুকছে ভেতরে। একটা মাত্র ঘর। তাতেই খাওয়া, ঘুমানো, বসার কাজ চলে। সীমাহীন দুরবস্থা।

এক নজরেই বোঝা গেল, কি ঘটেছে। কেন সাড়া পাওয়া যায়নি। চারটে খুঁটির ওপর তক্তা ফেলে বানানো একটা খাটিয়ায় চিত হয়ে শুয়ে আছে এক মহিলা। হাত দুটো বুকের ওপর আড়াআড়ি ফেলে রাখা। ভঙ্গিতেই বোঝা গেল, মারা গেছে। বিছানার কাছে মাটিতে বসে ফোঁপাচ্ছে একটা বাচ্চা ছেলে, গালে পানির দাগ। মারকভ ঘরে নেই।

রবিনকে বলল ওমর, 'ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করো তো ওর বাবা কোথায়।'

জিজ্ঞেস করল রবিন।

ছেলেটা জবাব দিল না। ভয়ে কুঁকড়ে আছে। অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে আবার কাঁদতে শুরু করল।

'ভাল বিপদে পড়া গেল! কি করা যায়?' বুঝতে পারছে না ওমর। 'মহিলা মরে গেছে। মারকভ যদি এখনই প্রতিশোধ নিতে গিয়ে থাকে, আমাদের সরে পড়াই ভাল।'

আরেকবার ছেলেটাকে কথা বলানোর চেষ্টা করল রবিন। ওর বাবা কোথায় গেছে জিজ্ঞেস করল। সঙ্গে করে কুড়াল নিয়ে গেছে কিনা তা-ও জানতে চাইল। কিন্তু একই অবস্থা। জবাব নেই।

মাথা নাড়তে নাড়তে ওমর বলল, 'কোন লাভ হবে না।'

'কি করব?'

'দেখি আরেকটু অপেক্ষা করে, মারকভ আসে কিনা। না এলে আর কি করব, ফিরেই যাব। মরা মায়ের কাছে বাচ্চাটাকে রেখে বাপ একেবারে চলে গেছে, এটা বিশ্বাস হয় না আমার।'

কুঁড়ের সামনে থাকলে কেউ দেখে ফেলতে পারে, এই ভয়ে বনের মধ্যে গাছের আড়ালে এসে ঢুকল ওরা।

এক ঘণ্টা পর এল মারকভ। লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে গেল কুঁড়ের দিকে। হাতে একটা বেলচা। কোমরে ঝুলছে কুড়ালটা।

গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এগিয়ে গেল রবিন।

ঝটকা দিয়ে তার দিকে ঘুরে গেল মারকভ। তার দিকে তাকিয়ে মায়াই লাগল ওমরের। মড়ার মুখের মত সাদা মুখ, ভাবান্তর নেই। চোখের দৃষ্টিতে নেই কোন আশা, কোন আবেগ; সব ঝেঁটিয়ে দূর হয়ে গেছে।

'আপনার স্ত্রী মারা গেছে,' কথা শুরুর জন্যে বলল রবিন। নিজের কানেই বেখাপ্পা শোনাল কণ্ঠটা।

'হ্যাঁ, মারা গেছে।'

'খারগাকে খুঁজতে গিয়েছিলেন?'

'না। অনেক জরুরী কাজ বাকি। একটা বেলচা ধার করতে গিয়েছিলাম।

বাচ্চাটার ভার নিতে অনুরোধ করেছি এক বিধবাকে। তার কাছেই এখন নিয়ে যাব ওকে।' ওমরকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এই লোকটা কে?'

'বন্ধু।'

'অ।' আর কোন কৌতূহল নেই।

প্রতিটি কথা ওমরকে অনুবাদ করে শোনাতে লাগল রবিন।

'বাচ্চাটাকে দেয়ার পর কি করবেন?'

'এখানেই থাকব খারগার অপেক্ষায়। এলে ওকে খুন করব। না এলে কুঁড়েটা পুড়িয়ে ছাই করে দিয়ে বনে ঢুকে যাব। তারপর গিয়ে ওকে খুন করে আসব।' এমনভাবে বলল মারকভ, যেন একটা ইঁদুর মারার কথা বলছে।

'বনে কোথায় থাকবেন?'

'একটা গুহা চিনি আমি।' বেড়ায় ঝোলানো ভালুকের চামড়াটা দেখিয়ে বলল, 'ওর বাড়ি ছিল। এখন থেকে হবে আমার বাড়ি, যতদিন না মরি। ওখানে আমাকে কেউ খুঁজে পাবে না।'

'ওকে বলো,' রবিনকে বলল ওমর, 'আপত্তি না থাকলে আমি ওর সঙ্গে কথা বলব।'

মারকভের সঙ্গে কথা বলে ওমরকে জানাল রবিন, 'না, আপত্তি নেই ওর। তবে আগে বাচ্চাটাকে দিয়ে আসতে চাচ্ছে। দিয়েই ফিরে আসবে।'

'ঠিক আছে।'

ঘরে ঢুকল মারকভ। একটু পরেই বেরিয়ে এল বাচ্চাটার হাত ধরে।

একটা গাছের গুঁড়িতে বসে পড়ল ওমর। সিগারেট ধরাল। 'বিশ্বাস হচ্ছে না আমার। এত কষ্টের মধ্যেও বেঁচে থাকে মানুষ, কি ভয়ঙ্কর! আর মানুষও একজন আরেকজনের সঙ্গে কি জঘন্য ব্যবহার করে! খারগার কথা বলছি।'

'ওর সঙ্গে ব্যবহার দেখেই বুঝতে পারছি বাবার সঙ্গে কি করে!' রাগ প্রকাশ পেল রবিনের কথায়।

'খারাপ যে করে তাতে কোন সন্দেহ নেই।'

আরও ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করার পর ফিরে এল মারকভ। সোজা ওদের কাছে এসে দাঁড়াল। ভাবাবেগশূন্য চেহারা।

'এলাম,' ভোঁতা গলায় বলল সে। 'কি জানতে চান বলুন?'

ওমরকে অনুবাদ করে শোনাল রবিন।

'আমরা কেন এসেছি, জানাতে চাই আপনাকে,' ওমর বলল। 'শোনার পর আপনি বলবেন আমাদের সাহায্য করতে রাজি আছেন কিনা।...আমাদের বোট নেই, প্লেনে করে এসেছি। মোহনার কাছে একটা ল্যাগুনে লুকিয়ে রেখেছি। ওদিকে কি লোকজন যায়?'

'কৃচিৎ এক-আধজন। শিকারী কিংবা জেলে যায়,' মারকভ বলল। 'আমার বাড়ির পরে আর কোন বাড়ি নেই। কাজেই আরও ওদিকে উঠলে যাওয়ার প্রয়োজন পড়ে না কসাকদের। তবে শয়তানের বাচ্চা ওই খারগাটাকে আমি খুন করে পালালে সমস্ত দ্বীপে ছড়িয়ে পড়বে ওরা। এক ইঞ্চি জায়গাও বাদ দেবে না।'

'খারগা তো সাথে লোক নিয়ে আসে। খুন করবেন কি করে?'

'সব ক'টাকে খুন করব আমি।'

মারকভের দিকে তাকাল ওমর, 'আপনি সত্যি খারগাকে খুন করতে চান?'

'নিশ্চয়ই। আপনি বিশ্বাস করছেন না আমার কথা? আমার জীবনটাকে নরক বানিয়ে ছেড়েছে ও। আরও অনেকেরই এ হাল করেছে। বহু মানুষের রক্ত লেগে আছে ওর হাতে। ঋণ পরিশোধ করতে হবে এবার।'

'আপনি ওকে খুন করলে ফাঁসিতে ঝোলাবে আপনাকে।'

'ধরতে হবে তো আগে। বনের মধ্যে আমাকে খুঁজে বের করা অত সহজ না। তারপরেও যদি ধরেই ফেলে, ফেলুক, কিসের জন্যে বাঁচব আর? স্ত্রীকে হারালাম। পালক ছেলেটাকে অন্যের হাতে তুলে দিয়ে আসতে হলো। ওই শয়তানদের অত্যাচারে মারা গেছে আমার স্ত্রী। এর শাস্তি ওদের পেতেই হবে।'

লম্বা শ্বাস নিল ওমর। 'আপনার মনের অবস্থা বুঝতে পারছি। আপনি তো এখন একা। শার্খালিন থেকে পালালেই পারেন।'

'না, পালানোর কোন ইচ্ছে আমার নেই। সে-আশা বহুকাল আগেই মরে গেছে। একটাই ইচ্ছে এখন আমার, খারগাকে খুন করা।'

'টাকা পেলে কোন সুবিধে হয়?'

'কোন কিছু দিয়েই আর কোন সুবিধে হবে না আমার।'

কেন এসেছে এ দ্বীপে, সংক্ষেপে জানাল ওমর। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'বহুদিন জেলে কাটিয়েছেন আপনি। আমেরিকান লোকটাকে কোন দিকের সেলে রাখা হয়, বলতে পারবেন?'

'আমি জেলে থাকতে তো তার সঙ্গে দেখা হয়নি। অনেক পরে এসেছে। কোনদিকে রাখে বলতে পারব না।'

'তার সঙ্গে কি দেখা করা সম্ভব?'

'দেখা করা মানে আপনি লুকিয়ে থেকে দেখতে পারবেন। কথা বলতে পারবেন না। বলতে গেলে গার্ডদের চোখে পড়তে হবে। আপনাকেও ধরে নিয়ে গিয়ে জেলে ঢোকাবে।'

'কোনখানে গিয়ে দেখতে হবে?'

'রোজ কাজে নিয়ে যাওয়া হয় কয়েদীদের। সবাইকেই কাজ করতে হয়। করাত কলে কিংবা কয়লা পাহাড়ে।'

'জেলের ভেতরে যাওয়া যায় না?'

'জেলে ঢোকা খুব কঠিন। অনেক সৈন্য পাহারা দেয় ওখানে। তাদের চোখ এড়িয়ে ঢোকা অসম্ভব।'

'বাইরে যারা কয়েদীদের পাহারা দেয়, তাদের হাতে তো নিশ্চয় অস্ত্র থাকে?'

'সব সময়। কখনও খালি হাতে থাকে না কেউ। হয় রাইফেল, নয়তো রিভলভার। কাউকে দৌড় দিতে দেখলেই গুলি করে। কারও যদি জীবনের মায়া ফুরিয়ে যায়, আত্মহত্যা করার ইচ্ছে হয়, তাহলে আর কিছু করা লাগবে না, গার্ডদের সামনে দৌড় দিলেই হলো। গুলি খেয়ে চোখের পলকে পরপারে চলে যাবে।...তবে অলৌকিক ভাবে বেঁচে গিয়েছিল একজন। গুলি লাগেনি গায়ে। পর্বতের দিকে পালিয়েছে সে। ওর কি হয়েছে আমি জানি না। কোনদিন আর জেলে

ফিরে আসেনি।'

'দিনের বেলা কয়েদীদের যখন কাজ করতে নিয়ে যাওয়া হয়, তখনও কি জেলখানায় লোক থাকে?'

'তা তো থাকেই। প্রহরীরা থাকে। কয়েদীও থাকে বেশ কিছু। ওরা ধোয়ামোছা, রান্নাবাড়ার কাজ করে।'

'রাতে কিভাবে রাখা হয়?'

'লম্বা লম্বা সেল আছে, প্রতিটিতে দশ জন করে ঘুমায়। প্রতিটি সেলই এক রকম—লম্বা, সরু সরু। শেষ মাথায় একটা করে দরজা, তাতে লোহার মোটা মোটা শিক লাগানো। জেলখানার ভেতরের পুরো এলাকাটা ঘিরে উঁচু দেয়াল। রাত-দিন দেয়ালের ওপরে সেন্ট্রি বক্সে বসে পাহারা দেয় রাইফেলধারী সান্ত্রী। ওখানে বসলে বহুদূর পর্যন্ত চোখে পড়ে। দেয়ালের বাইরের দিকে পরিখা। চওড়া বেশি না। তবে তাতে পানির পরিবর্তে আছে গভীর কাদা। মাথা খারাপ করে এক কয়েদী একদিন সান্ত্রীদের বক্সে ওঠার সিঁড়ি বেয়ে উঠে তাতে ঝাঁপ দেয়। কাদার মধ্যে তলিয়ে যায় সে। কোনমতেই মাথা তুলতে পারেনি আর। পরিখা পেরোনোর একটাই প..—একটা ব্রিজ আছে, জেলখানার সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে সে ব্রিজ পেরোতে হয়। তাতে সব সময় কড়া পাহারা থাকে।'

রবিনের দিকে তাকিয়ে ভ্রূকুটি করল ওমর, 'হুঁ। তারমানে জেল থেকে পালানো পুরোপুরি অসম্ভব করে রেখেছে ওরা। রবিন, জিজ্ঞেস করো তো গভর্নরের নাম কি?'

জিজ্ঞেস করল রবিন।

'কর্নেল বগানিন,' মারকভ জানাল।

'কি ধরনের মানুষ?'

'আসলেই ও মানুষ কিনা গবেষণার বিষয়। কি ধরনের লোককে নিয়োগ করবে ওরা আন্দাজ করতে পারছেন না? এখানে পদোন্নতিই হয় নিষ্ঠুরতা দেখিয়ে। যে যত নিষ্ঠুর, সে তত যোগ্য লোক। দয়ামায়ার ছিটেফোঁটা নেই, সারাক্ষণ ভদকা গিলে মাতাল হয়ে থাকে। সবার ওপর তার রাগ, এমনকি নিজের সৈন্যদের ওপরও। সব সময় তলোয়ার থাকে সঙ্গে। ইচ্ছে হলেই বাড়ি মারে, ইচ্ছে হলে খোঁচা মারে।'

'তারমানে কোন একদিন রেগে গিয়ে ওকেও খুন করে বসতে পারে কেউ।' রবিনকে বলল ওমর, 'মারকভকে জিজ্ঞেস করো, কয়েদীরা যেখানে কাজ করে, সেখানে আমাদের নিয়ে যেতে পারবে কিনা। কিছু করার আগে তোমার বাবা কোথায়, কিভাবে আছেন, জেনে নিতে হবে আমাদের।'

জিজ্ঞেস করে জবাব দিল রবিন, 'হ্যাঁ, সে আমাদের নিয়ে যেতে পারবে বলছে। তবে সেটা তাড়াতাড়ি করতে হবে। কারণ খারগাকে খুন করে পর্বতে গিয়ে লুকানোর জন্যে পাগল হয়ে উঠেছে সে।'

'কোন্ সময় হলে ভাল হয়?'

'সকালে। যখন কয়লা পাহাড়ে কাজ করতে যায় কয়েদীরা। রোজ কাজ করে ওরা। এমন একটা জায়গায় নিয়ে যাবে আমাদের, যেখান থেকে আমরা কয়েদীদের যেতে দেখব, কিন্তু ওরা আমাদের দেখবে না। মাঝে মাঝে নাকি সময় কাটানোর জন্যে গিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে দেখে ও। গোপে, ও যখন ছিল কতজন ছিল, এখন

কতজন আছে।'

সঙ্গে করে নিয়ে আসা খাবারগুলো মারকভকে দিয়ে জিজ্ঞেস করল রবিন, আর কিছু লাগবে কিনা।

মারকভ বলল, চিনি আর চা কি জিনিস ভুলেই গেছে। খেতে মন চাইছে।

'ঠিক আছে,' রবিন বলল, 'কাল সকালেই নিয়ে আসব।'

বিমানে ফিরে চলল সে আর ওমর।

'আজব লোক,' রবিন বলল। 'মৃত্যু ভয় নেই। পরিবেশই সম্ভবত এ রকম করে দিয়েছে।'

'হ্যাঁ, পরিবেশই মানুষকে একেক রকম বানায়,' ঘনিয়ে আসা অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ভারী গলায় বলল ওমর। 'ওর সঙ্গে যোগাযোগটা আমাদের কতখানি সহায়তা করবে বুঝতে পারছি না। উপকার হবে, সন্দেহ নেই; কিন্তু খারগাকে খুন করে বসলে যে শোরগোল শুরু হবে, তাতে আমাদের কাজে বাধা আসবে প্রচুর।'

'ওকে বোঝালে কেমন হয়? খারগাকে যাতে খুন না করে?'

'শুনবে না। ওর কাছে খারগাকে খুন করাটা খুন নয়, দায়িত্ব। প্রতিশোধ নিতে না পারলে নিজেকে ও ক্ষমা করবে না।'

'কুড়াল দিয়ে খুন করার এত ঝোঁক কেন?'

'আর কোন অস্ত্র নেই বলে।'

বিমানে পৌঁছতে পৌঁছতে পুরোপুরি অন্ধকার হয়ে গেল। দেখল, ভীষণ চিন্তায় পড়ে গেছে কিশোর আর মুসা। ওদের খোঁজে বেরোনোর কথা ভাবছিল।

দেরিটা কেন হয়েছে, জানাল ওমর।

চার

এক এক করে মিলিয়ে যাচ্ছে তারাগুলো। ভোরের দেরি নেই। মারকভের কুঁড়ের দিকে চলেছে তিন গোয়েন্দা।

ফ্যাকাসে হয়ে আসছে আকাশের রঙ। বনের মধ্যে এখনও কালিগোলা অন্ধকার। বাঁয়ে আকাশের পটভূমিতে পর্বত-চূড়ার আকৃতিটা রূপ নিতে আরম্ভ করেছে সবে। তুষার কণা ভাসছে বাতাসে। ছুরির মত ধারাল ঠাণ্ডা বাতাস যেন হাড় ভেদ করে মজ্জায় গিয়ে ঢোকে।

আধো অন্ধকারে মারকভকে অপেক্ষা করতে দেখল ওরা। কুড়ালটা কোমরে ঝোলানো। মাটি চাপা দেয়া নতুন একটা কবর। তাতে কোনমতে বানানো একটা কাঠের ক্রুশ পোঁতা। পাশে দাঁড়িয়ে আছে মারকভ।

খাবারের পোঁটলাটা সাগ্রহে হাতে নিল সে। ধন্যবাদ দিল। পুঁতে রাখল একটা গাছের গোড়ায়। পাতা ছড়িয়ে ঢেকে দিল জায়গাটা। তারপর ওদের আসতে ইশারা করে নদীর তীর ধরে হাঁটা শুরু করল।

বিশ মিনিট পর ধোঁয়ার গন্ধ ঢুকল ওদের নাকে। আরও কিছুক্ষণ হাঁটার পর

গাছের ফাঁক দিয়ে দেখা গেল ধোঁয়ার উৎস। মারকভের কুঁড়েটার মতই আরেকটা কুঁড়ে। দূর দিয়ে সেটার পাশ কাটিয়ে এল। একই রাস্তায় আরও দুটো কুঁড়ে পড়ল। মোহনা পেছনে ফেলে এসেছে ওরা। নদীটা এখন অনেক সরু হয়ে এসেছে, বড়জোর তিরিশ গজ। মাটি আর পানির মাঝে নলখাগড়ার দেয়াল রয়েছে এখানেও। মাঝে মাঝে কোথাও কোথাও ছাড় দিয়েছে নলখাগড়া। পাথুরে তীরভূমি শ্যাওলায় ঢাকা। ছোট ছোট অগভীর খাঁড়ি আছে। প্রচুর বাঁক নদীতে।

ফার বনের যেন শেষ নেই। মাঝে মাঝে কিছু বার্চ। নদীর পাড়ের মাটি এখানে এবড়োখেবড়ো, পাথুরে। পানিতে প্রচুর বরফের কুচি ভাসছে।

ওদেরকে নিয়ে টিলার মত একটা উঁচু জায়গায় উঠল মারকভ। কোন কথা না বলে হাত তুলে দেখাল।

সামনে সিকি মাইল দূরে মোটামুটি সমতল একটা উঁচু জায়গায় জঙ্গল পরিষ্কার করে তাতে বিল্ডিং তোলা হয়েছে। পাথরে তৈরি, বিশাল বাড়ি। কেমন এক ধরনের বিষণ্ণতা ঘিরে রেখেছে বাড়িটাকে।

শাখালিনের কুখ্যাত জেলখানা।

দুই পাল্লার বিরাট গেটটা বন্ধ। ওটার কাছ থেকে নানা দিকে পথ চলে গেছে। সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হয় যে চওড়া রাস্তাটা, সেটা গিয়ে শেষ হয়েছে কয়েকটা কাঠের তৈরি বাড়ির সামনে। প্রচুর কাঠ আর গাছের গুঁড়ি স্তূপ করে রাখা হয়েছে ওখানে। করাত কল, বোঝা যায়। করাত কলের কাছ থেকে আরেকটা চওড়া রাস্তা চলে গেছে ঢালের দিকে, হারিয়ে গেছে ঝোপঝাড়ের মধ্যে।

রবিনকে বলল কিশোর, 'রাস্তাটা কোথায় গেছে জিজ্ঞেস করো ওকে।'

মারকভ জানাল, 'খনি আর রেললাইনের কাছে।'

অবাক হলো কিশোর। 'এখানে রেললাইন আছে?'

মারকভের সঙ্গে আবার খানিকক্ষণ কথা বলে রবিন জানাল, 'আছে। সরু লাইন, ছোট ছোট লোহার ছাতখোলা বগি চলে তার ওপর দিয়ে। কয়লা আর কাঠ নিতে আসে।'

তিন গোয়েন্দাকে নিয়ে টিলা থেকে নেমে এসে আবার হাঁটতে শুরু করল মারকভ। আলো বাড়ছে। খোলা জায়গায় থাকা ঠিক না। জঙ্গলে ঢুকে পড়ল। নদীর একটা বাঁক ঘুরতে জেলখানাটা দেখা গেল আবার। তারমানে অনেক উঁচুতে উঠে এসেছে।

নদীর ওপারে পাহাড়ের গায়ে দেখা যাচ্ছে কয়লার খেতটা। দূর থেকে লাগছে পাহাড়ের গায়ে একটা ক্ষতের মত। ওটায় যাওয়ার রাস্তাটা পাহাড়ের কাঁধ ঘুরে নেমে এসেছে একেবারে নদীর সমতলে; নদীর সমান্তরালে এগিয়েছে কিছুদূর—ওদের কাছ থেকে তিরিশ গজ দূরে—তারপর আবার বাঁক নিয়ে চলে গেছে কয়লা পাহাড়ের দিকে। ওরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেটা একটা পাথরের স্তূপ, ভূমিধস নেমে সৃষ্টি হয়েছিল কোন এক সময়; খাঁজে খাঁজে জন্মে আছে ঘাস, ঝোপঝাড়, ছোট ছোট গাছপালা। লুকিয়ে বসে ওপারের রাস্তার দিকে নজর রাখার এক আদর্শ জায়গা। এখানে থাকলে কারও চোখে পড়ার সম্ভাবনা নেই।

লুকিয়ে পড়তে ইশারা করল মারকভ।

'কোনখান দিয়ে নদীটা পেরোলে সবচেয়ে ভাল হয়, জিজ্ঞেস করো তো ওকে,' রবিনকে বলল কিশোর। 'নদীটা পেরোনোর প্রয়োজন পড়বেই আমাদের, বুঝতে পারছি।'

মারকভ জানাল, 'আমাদের সামনেই একটা অগভীর জায়গা আছে, পানি একেবারে কম। কাছে একটা ব্রিজও আছে, বাঁকের ওপাশে। বনের ভেতর দিয়ে এসেছি বলে দেখতে পাননি।'

নিচু স্বরে রবিনকে কিছু বলল মারকভ। রবিন জানাল মুসা আর কিশোরকে, 'মারকভ বলছে, বাবাকে কয়লা পাহাড়ে না-ও কাজ করাতে পারে। হয়তো করাত কলে নিয়ে যায়। কয়লা পাহাড়ে করলে যাওয়ার সময় দেখতে পাবই। আসার সময় হয়েছে ওদের।'

কয়েক মিনিট পরই জেলখানার দিক থেকে পাহাড়ের কাঁধ ঘুরে এগিয়ে আসতে দেখা গেল দলটাকে। প্রহরী আর কয়েদীদের আলাদা করে চিনতে কোন অসুবিধে নেই। প্রহরীদের কারও হাতে চাবুক, কারও রাইফেল। পরনে ইউনিফর্ম—কালচে ধূসর মিলিটারি সার্ভিস ড্রেস। কয়েদীদের পোশাক হলুদ আর কালো ডোরাকাটা কাপড়ে তৈরি। রঙটা এমন ভাবে বাছা হয়েছে যাতে চোখে পড়ে সহজেই, লুকাতে অসুবিধে হয়। দুই সারিতে চলছে ওরা। কারও কারও হাতে কয়লা তোলার আনকোরা যন্ত্রপাতি। উনত্রিশ জন, গুনল কিশোর। বারোজন রাইফেলধারী প্রহরী; দুজনের হাতে চাবুক, কারণে-অকারণে গরু-ছাগলের মত পেটাতে পেটাতে নিয়ে চলেছে কয়েদীদের।

মার খেয়ে কেউ প্রতিবাদ করছে না। নীরবে এগিয়ে চলেছে। নরম মাটিতে পা পড়ার শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই।

যে অবস্থা, ওদের মধ্যে মিস্টার মিলফোর্ডকে খুঁজে বের করা সহজ নয়, বুঝতে পারল কিশোর। শুধু পোশাক যে এক রকম পরেছে তা-ই নয়, দেখতেও সবাইকে এক রকম লাগছে। লম্বা লম্বা চুল, বহুদিনের না কামানো দাড়ি-গোঁফে ঢাকা মুখ। চেহারা চেনার উপায় নেই।

কাছে চলে এসেছে দলটা। নদীর ওপারে গোয়েন্দাদের সামনে দিয়ে যাচ্ছে এখন। ইংরেজিতে কথা বলে উঠল একটা কণ্ঠ, তাতে কড়া বিদেশী টান, 'অনেক হয়েছে, আর না। আর সহ্য করব না আমি!'

'বোকামি কোরো না,' আরেকটা কণ্ঠ বলল। বুকের মধ্যে রক্ত ঝলকে উঠল রবিনের। ওর বাবার গলা, কোন সন্দেহ নেই। মুসা আর কিশোরও চিনতে পারল কণ্ঠটা।

চাবুক হাতে দৌড়ে এল একজন প্রহরী। শপাং শপাং করে বাড়ি মারতে লাগল দুজনের পিঠে। দুজনের মধ্যে বেলচা কাঁধে নিয়ে হাঁটছিল যে খাটোমত লোকটা, সে চোখের পলকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বাঁ করে বেলচা বসিয়ে দিল প্রহরীর মাথায়। প্রহরী মাটিতে লুটিয়ে পড়ার আগেই হাত থেকে বেলচা ফেলে দিয়ে নদীর দিকে দৌড় মারল। কি ঘটবে জানা আছে তার। তাই সোজা না ছুটে এঁকেবেঁকে ছুটল। শুরু হলো গুলিবৃষ্টি। খামচি দিয়ে মাটি তুলে ফেলতে লাগল বুলেট, পাথরে পিছলে উড়ে গেল প্রাণ কাঁপানো শব্দ তুলে, গাছের গায়ে গিয়ে বিঁধতে লাগল।

কিন্তু লোকটা থামল না। পেছন ফিরে তাকাল না। পৌঁছে গেল নদীর ধারে। গুলি করে ওখানে তাকে লাগানো এখন আর সহজ না। পানিতে নেমে পড়ল সে। জানাই ছিল যেন ওখানে পানি কম। ফুলঝুরির মত পানি ছিটাতে ছিটাতে সেই অগভীর পানিতে দৌড়াতে লাগল। হোঁচট খেল একবার। দম বন্ধ করে ফেলল কিশোর, ভাবল, গুলি খেয়েছে বুঝি। কিন্তু না। সোজা হয়ে আবার ছুটল। নদীতে বেশ স্রোত। সমস্ত প্রতিকূলতা অগ্রাহ্য করে নদী পার হয়ে এপারে চলে এল সে। পাড়ে উঠেই হুমড়ি খেয়ে পড়ল মাটিতে। দ্রুত ক্রল করে বিপজ্জনক জায়গাগুলো পার হয়ে গিয়ে ঢুকে পড়ল বনের ভেতরে। কিশোররা যেখানে বসে আছে তার কাছ থেকে খানিক দূরে, নদীর ভাটির দিকে।

হুফ্ করে চেপে রাখা নিঃশ্বাসটা ছাড়ল কিশোর। 'বাপরে, কি খেলটাই দেখাল! আমি তো ভাবতেই পারিনি পালাতে পারবে। ওস্তাদ লোক।'

অন্য কয়েদীরা থমকে গেছে। জোরাল গুঞ্জন উঠেছে তাদের মাঝে। প্রহরীরা চিৎকার করছে। গোলমালের সুযোগে আরেকজন কয়েদী পালানোর চেষ্টা করল। কিন্তু সে অত চালাক নয়। দশ গজ যাওয়ার আগেই গুলি খেয়ে পড়ে গেল। রাইফেল তাক করে ধরা হলো বাকি কয়েদীদের ওপর। চাবুকের বাড়ি পড়তে লাগল। হুকুমের পর হুকুম। এক জায়গায় জড়ো করা হলো তাদের। প্রহরীদের ইনচার্জ খেপা ষাঁড়ের মত ফোঁস ফোঁস করতে লাগল রাগে। একজন সিপাই পাঠাল জেলখানায় খবর দিতে। চারজন সিপাই দৌড় দিল নদীর দিকে, নদী পেরিয়ে গিয়ে পলাতক আসামীকে ধরার জন্যে। ওকে ধরা অত সহজ নয়, ভাবল কিশোর, যেহেতু জখম হয়নি সে।

পাথরের স্তূপের ধারে ঝোপঝাড়ের মধ্যে যতটা সম্ভব গুটিয়ে বসে আছে তিন গোয়েন্দা আর মারকভ।

জেলখানার ঘণ্টা বাজা শুরু হলো। সার্চ পার্টি এল। ছড়িয়ে পড়ল বনের মধ্যে।

মৃদু স্বরে কিশোর বলল, 'আমাদের এখন কেটে পড়া দরকার।'

জেলখানায় গিয়েছিল যে প্রহরীটা, সে ফিরে এল। মেসেজ নিয়ে এসেছে। সেটা পড়ে কয়েদীদের উদ্দেশে আরও প্রচুর হুকুম আর ধমক-ধামক বিতরণ করল ইনচার্জ। কয়েদীদের নতুন ভাবে সারিবদ্ধ করা হলো। মার্চ করিয়ে আবার নিয়ে চলল কয়লা পাহাড়ের দিকে। যে প্রহরীটা মাথায় বেলচার বাড়ি খেয়েছে, তার মাথায় এখন ব্যান্ডেজ। টলতে টলতে জেলখানার দিকে চলে গেল সে। রইল কেবল মৃত কয়েদীটা। কুকুরের মত মরে পড়ে আছে সে, কারও নজর নেই ওর দিকে।

কিশোরের বাহুতে হাত রাখল রবিন। 'উঠতে বলছে মারকভ। বলছে, ঘুরপথে নিয়ে যাবে, সৈনারা এপারে এলেও যাতে ওদের চোখে না পড়তে হয়।'

ছুটতে শুরু করল মারকভ। তার সঙ্গে তাল রেখে দৌড়ানো কঠিন হয়ে পড়ল। অনেকক্ষণ একভাবে দৌড়ানোর পর গতি কমাল সে। বনের মধ্যে থেকে বেরোয়নি একবারের জন্যেও।

মাটিতে পড়ে থাকা দুটো গাছ দেখা গেল। চিনতে পারল মুসা। বলল, 'কুঁড়ের কাছে এসে গেছি। ওই গাছগুলো চিহ্ন। মনে আছে আমার।'

তার কথা শেষ না হতেই থেমে গেল মারকভ। রবিনের মাধ্যমে জানাল, এখন

সে একা গিয়ে দেখে আসবে কুঁড়ের কাছটা নিরাপদ কিনা। যেহেতু কয়েদী পালিয়েছে, সমস্ত বাড়িতে খোঁজা হবে, জানা কথা। তারমানে তার নিজেরটাও বাদ যাবে না।

আপত্তি করল না কিশোর। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিমানে ফিরে যেতে চায়।

মারকভের যেন কোন ক্লান্তি নেই। দ্রুত হেঁটে হারিয়ে গেল গাছপালার আড়ালে।

কিশোর বলল, 'আমার বিশ্বাস, যে লোকটা পালিয়েছে, সে মিকোশা। তাকে খুঁজে বের করা দরকার। তার কাছে জানা যাবে মিলফোর্ড আঙ্কেলকে কোন সেলে রাখা হয়েছে।'

'জানলে লাভ কি?' মুসার প্রশ্ন। 'জেলে ঢুকব কি করে? আরও সমস্যা আছে। এক সেলে যদি দশ জন মানুষ থাকে, তো একজনকে বের করে আনা যাবে না। বাকি সবাই সঙ্গে আসতে চাইবে।'

'কথাটা ভাবিনি আমি, তা নয়,' কিশোর বলল। 'পালাতে চাইলে পালাবে; ভালই হবে সেটা আমাদের জন্যে। একজনকে খোঁজার চেয়ে দশ জনকে খোঁজা ঝামেলা হয়ে যাবে ওদের জন্যে। ঘোলা পানিতে পালানো সহজ হবে আমাদের।'

তীক্ষ্ণ একটা চিৎকার চমকে দিল ওদের। সামনে থেকে এসেছে। দুই কি তিন সেকেন্ড থাকল, তারপর হঠাৎ শেষ হয়ে গেল। মাঝপথে কাটা পড়ে গেল যেন।

'মারকভ বিপদে পড়ল নাকি?' উদ্বিগ্ন হয়ে কিশোর বলল। 'চলো তো দেখি।'

পাঁচ

ফাঁকা জায়গাটুকু, যেখানে মারকভের কুঁড়েটা রয়েছে তার কাছ থেকে সামান্য দূরে গাছের আড়ালে এসে থামল ওরা। মারকভ দাঁড়িয়ে আছে। তার সঙ্গে কয়েদীর পোশাক পরা আরেকজন লোক। এক চোখের চারপাশে কালো দাগ, কপালে একটা কাটা। মাটিতে পড়ে আছে জেলখানার ইউনিফর্ম পরা একটা প্রহরী। পাশে পড়ে আছে তার রাইফেলটা।

'তাহলে এই ব্যাপার,' গম্ভীর মুখে বলল কিশোর। মাটিতে পড়ে থাকা লোকটার দিকে একবার তাকিয়েই বুঝে গেল যা বোঝার।

পালিয়ে আসা লোকটার দৃষ্টি দীর্ঘ একটা মুহূর্ত ঘোরাঘুরি করতে থাকল তিন কিশোরের ওপর। ধীরে ধীরে হাসি ফুটল দাড়ি-গোঁফে ঢাকা জঙ্গলের মধ্যে। 'তিন গোয়েন্দা। খবর তাহলে পেয়ে গেছ।...তুমি নিশ্চয় রবিন। বাবাকে নিতে এসেছ।'

এগিয়ে গেল রবিন. 'আপনি মিকোশা ওয়ানাকি, তাই না? হ্যাঁ, আপনাদের নিতে এসেছি আমরা।'

মাটিতে পড়ে থাকা লোকটাকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'এর এই অবস্থা কে করেছে?'

মারকভকে দেখাল মিকোশা, 'ও।'

'মারা গেছে?'

'কোন সন্দেহ নেই তাতে।'

'এখানে এই খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকাটা ঠিক হচ্ছে না,' বলে দেরি করল না কিশোর। বনে ঢুকে পড়ল।

সবাই অনুসরণ করল তাকে।

'আপনাদের হয়েছিল কি?' মিকোশাকে জিজ্ঞেস করল কিশোর। 'প্লেন ক্র্যাশ করেছিল নিশ্চয়?'

'এঞ্জিন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। পানিতে পড়লাম। একটা পেট্রল বোট থেকে দেখতে পেয়ে তুলে নিয়ে এল এখানে। তারপর সেই পুরানো কাহিনী। গুপ্তচরগিরির অভিযোগ এনে জেলে ভরে দিল দুজনকেই।'

'এখন যে পালালেন, উদ্দেশ্যটা কি ছিল আপনার? আমাদের আসার খবর তো জানতেন না। দ্বীপ থেকে বেরোতেন কি করে?'

'নদীতে গিয়ে একটা নৌকা জোগাড়ের চেষ্টা করতাম। তারপর রাতের বেলা সাগর পাড়ি দিয়ে জাপানে ঢুকে পড়তাম।'

'এই কুঁড়ের কাছে এসেছিলেন কেন?'

'শুকনো কাপড়ের জন্যে। এই ঠাণ্ডার মধ্যে শুকনো পরেই হি-হি কাঁপুনি, পরে আছি ভেজা। বনের মধ্যে দিয়ে ছুটতে ছুটতে কুঁড়েটা দেখে ভাবলাম কিছু পাওয়া যেতে পারে। সবে ভেতরে ঢুকেছি, বাইরে আওয়াজ হলো। বাড়ির মালিক এসেছে মনে করে বেরিয়ে দেখি একজন গার্ড। কোন সুযোগ দিল না আমাকে। রাইফেল দিয়ে বাড়ি মেরে মাটিতে ফেলে দিল। তারপর ইচ্ছেমত বাড়ি আর লাথি। অবশ বানিয়ে ফেলল। ওঠার শক্তি পাচ্ছিলাম না। চোখ বুজে ফেলেছিলাম। হঠাৎ বাড়ি বন্ধ হয়ে গেল। চোখ খুলে দেখি পড়ে যাচ্ছে গার্ড। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে মাথা থেকে।' মারকভকে দেখিয়ে বলল, 'এই লোকটার হাতে কুড়াল।...লোকটা কে?'

'একজন প্রাক্তন কয়েদী। রাশান। এই কুঁড়েটা তারই।'

'চেনো মনে হচ্ছে?'

'হ্যাঁ, এখানে এসে পরিচয় হয়েছে।'

'রাশান? বিশ্বাস করো?'

'করব না কেন? ভালমন্দ সব দেশেই আছে। শুধু রাশান বলেই তাকে অবিশ্বাস করার কোন কারণ নেই। বিনা দোষে ওকে জেল দিয়ে ওর জীবনটা ধ্বংস করে দিয়েছে, তাই জেলের লোকদের দেখতে পারে না সে। ওদের অত্যাচারের প্রতিশোধ নিচ্ছে এখন।'

'হুঁ,' মাথা দোলাল মিকোশা। 'ওদের ওপর তার প্রচণ্ড আক্রোশ। গার্ডটাকে কোপ মারার সময় যে রকম ঘৃণা দেখলাম ওর চোখে; মনে হলো মেরে খুব মজা পাচ্ছে।'

'শুনে মোটেও অবাক হলাম না।'

'আমাকে সাহায্য করার ছুতোয় একটা প্রতিশোধ নিল সে, তাই না?'

'রক্তের জন্যে ও পাগল হয়ে গেছে। স্বামী-স্ত্রী দুজনে মিলে জেল খেটেছিল দশ বছর। গতকাল ওর স্ত্রী যক্ষ্মা আর থারগার অত্যাচারে মারা গেছে। মারকভ প্রতিজ্ঞা করেছে, জেলখানার প্রহরীদের যাকে বাগে পাবে, তাকেই খতম করে দেবে।'

কি যেন বলল মারকভ।

অনুবাদ করে শোনাল রবিন, 'ও জানতে চাইছে ওকে আর প্রয়োজন আছে কিনা আমাদের। না থাকলে কুঁড়েটা পুড়িয়ে দিয়ে গুহায় চলে যাবে।'

'লাশটার কি হবে?'

জিজ্ঞেস করে জবাব দিল রবিন, 'ও বলছে, ব্যবস্থা করে ফেলবে। আরও গার্ড চলে আসার আগেই আমাদের চলে যেতে বলছে।'

মিকোশার দিকে তাকাল কিশোর। 'আসুন। মারকভকে নিয়ে চিন্তা নেই। জঙ্গল ওর কাছে বাড়িঘর। কিন্তু আপনি এ ভাবে বেশিক্ষণ টিকতে পারবেন না।'

'হ্যাঁ, পেটের খিদে আরও খানিক সহ্য করতে পারব। মারা যাচ্ছি শীতে। এ রকম ভেজা কাপড়ে···সহ্য করতে পারছি না আর।'

'হ্যাঁ, প্লেন পর্যন্ত যাওয়াও কঠিন হয়ে যাবে। দাঁড়ান, দেখি, মারকভকে জিজ্ঞেস করে। কোন ব্যবস্থা করতে পারে কিনা। রবিন, জিজ্ঞেস করো তো ওর কাছে কিছু আছে নাকি। যা কিছু হোক, ঠাণ্ডা ঠেকাতে পারলেই চলবে।'

মারকভের সঙ্গে কথা বলল রবিন। তারপর জানাল, 'ও বলছে, পরনে যা পোশাক আছে সেটাই সম্বল ওর। তবে চামড়ার একটা পুরানো ওভারকোট আছে, বাড়তি।'

'ওতেই চলবে।'

'গার্ডের রাইফেলটা রেখে দিতে চাচ্ছে সে।'

'দিক না। ওটাতে ওর অধিকারই তো বেশি।'

কিশোর যা বলল, মারকভকে জানাল রবিন।

এগিয়ে গিয়ে রাইফেলটা তুলে নিল মারকভ। কুঁড়েতে ঢুকল। বেরিয়ে এল একটা ওভারকোট নিয়ে। কয়েকটা নেকড়ের চামড়া সেলাই করে জুড়ে দেয়া হয়েছে। নামে ওভারকোট, কিন্তু আসলে কি জিনিস হয়েছে বলা মুশকিল। তবে সেটাই আগ্রহের সঙ্গে হাতে তুলে নিল মিকোশা। যে জিনিসই হোক, গায়ে দিয়ে আগে শীত ঠেকানো দরকার।

'রবিন,' কিশোর বলল, 'আমাদের জন্যে যা করল ও, তার জন্যে মারকভকে আমাদের সবার তরফ থেকে ধন্যবাদ দাও। বলো, ওকে যে কোনভাবেই হোক সাহায্য করতে পারলে খুশি হব আমরা। আমরা কোথায় আছি, ওর ধারণা আছে। খাবার বা অন্য যে কোন কিছুর প্রয়োজন হলে যেন নির্দ্বিধায় চলে আসে।

মারকভের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রওনা হয়ে গেল ওরা।

কয়েক কদম গিয়ে ফিরে তাকাল কিশোর। দেখল, ওদের দিকেই চেয়ে আছে মারকভ। ওর মুখ দেখে বোঝা গেল না মনে কি চলছে।

হাত নাড়ল কিশোর।

জবাবে মারকভও হাত নেড়ে ঘুরে দাঁড়াল।

'গুহা থেকে ফিরে আসলে ও,' রবিন বলল, 'খারগাকে খুন না করে স্বস্তি নেই। যে কাণ্ড করল আজ ও, রীতিমত ভয় লাগছে ওকে আমার। কুড়াল দিয়ে কুপিয়ে লোকটার মাথা দু'ফাঁক করে মেরে ফেলল, কোন বিকার নেই; যেন একটা মশা মেরেছে।'

'ওর সম্পর্কে এ সব মন্তব্য করার কোন অধিকার নেই আমাদের,' কিশোর বলল। 'জেলখানা নামের ওই ভয়ানক নরকটাতে দশটা বছর কাটাতে হলে ও যা করছে, তারচেয়ে কম কিছু করতাম না আমরাও। ওর চোখের দিকে তাকিয়ে দেখেছ? এত বছরের দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণা আর বঞ্চনার জ্বালা মগজের সব অনুভূতি ভোঁতা করে দিয়েছে ওর।'

কথা বাড়াল না আর ওরা। দ্রুত এগিয়ে চলল বনের ভেতর দিয়ে।

খালের পাড়ে আগের জায়গাতেই বাঁধা আছে ডিঙিটা। তারমানে এদিকে এখনও আসেনি প্রহরীরা। দড়ি খুলে নিয়ে তাতে চেপে বসল সবাই।

উদ্বিগ্ন হয়ে বিমানের দরজায় অপেক্ষা করছে ওমর। দেখেই বলে উঠল, 'তোমাদের দেরি দেখে তো চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম। ডিঙিটাও নেই। থাকলে চলে যেতাম।'

'না গিয়ে ভাল করেছেন,' কিশোর বলল। 'কয়েদী পালিয়েছে। সারা বনে ছড়িয়ে পড়ছে সৈন্যরা।'

মিকোশাকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল ওমর, 'নিশ্চয় মিস্টার ওয়াসাকি? কোথায় পেলে একে?'

মৃদু হেসে কিশোর বলল, 'ইনিই তো পালানো কয়েদী। ভেতরে চলুন, বলছি সব।'

ছয়

খেতে বসেছে সবাই। বহুদিনের অভুক্ত মানুষের মত গোগ্রাসে গিলতে লাগল মিকোশা। দুই কেটলি পানি গরম করতে হলো রবিনকে, যাতে মিকোশার কফির অভাব না পড়ে।

'আসল কথায় আসা যাক এবার,' মিকোশার দিকে সিগারেট বাড়িয়ে দিল ওমর। 'প্রথম কথা, মিস্টার ওয়াসাকি···'

'শুধু মিকোশা বললেই চলবে।'

'থ্যাংক ইউ।···মিকোশা, মিস্টার মিলফোর্ডকে কিভাবে উদ্ধার করে আনা যায় একটা পরামর্শ দিন তো। জেলে ঢুকে বের করে আনা সহজ, নাকি বাইরে যখন কাজ করাতে নিয়ে যায় তখন?'

'অবশ্যই বাইরে থেকে,' নির্দ্বিধায় জবাব দিল মিকোশা।

'তাঁকে মুক্ত করে আনার আগে যোগাযোগের কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব?' কিশোর জানতে চাইল।

'তার কি কোন দরকার আছে?'

'আছে। পালানোর জন্যে তৈরি থাকবেন তিনি। তাতে অ্যাক্সিডেন্টের সম্ভাবনা কম।'

'হুঁ, তা বটে,' মাথা দোলাল মিকোশা। কফির কাপে চুমুক দিল। 'আমার জানামতে যোগাযোগ করার একটা জায়গাই আছে। কয়লা পাহাড়।'

'কেমন দেখতে? কাছে থেকে দেখা সম্ভব?'

'দূর থেকে সম্ভব, তা-ও টহলে বেরোনো গার্ডদের সঙ্গে ধাক্কা খাওয়ার ইচ্ছে থাকলে। মাটির কয়েক ফুট গভীরেই রয়েছে কয়লা। দু'তিনশো গজ জায়গা জুড়ে গা থেকে মাটি খসিয়ে কয়লা বের করা হয়েছে। আসলে কয়লারই পাহাড় ওটা। মাটির নিচ থেকে ঢিবির মত উঁচু হয়ে উঠেছে। গা থেকে যেখানেই মাটি আর অন্যান্য জঞ্জাল সরানো হোক, বেরিয়ে পড়ে কয়লা।'

'ওসব জঞ্জাল নিশ্চয় নিচে, আশেপাশেই জমা করে রাখা হয়?'

'নেবে আর কোথায়? তা ছাড়া সরানোর দরকারই বা কি? সব কিছু মিলিয়ে অতি জঘন্য লাগে দেখতে। যেতে চাইলে তোমাকে নিয়ে যেতে পারি আমি, যখন কাজ হয় না ওখানে।'

'যাওয়ার সবচেয়ে ভাল সময় কখন?'

'ভোরের আগে, কিংবা সন্ধ্যায়, চাঁদ ওঠার পরে। কেউ থাকে না তখন।'

'সব সময় কি একই জায়গায় কাজ করতে নিয়ে যায় কয়েদীদের?'

'তা তো নেবেই, পাহাড়টা তো আর সরানো যাবে না। কেউ কয়লা তোলে, কেউ জঙ্গল কাটে—বনও পরিষ্কার হয়, কাঠও পাওয়া যায়। বড় বড় গাছ করাত কলে পাঠিয়ে দেয়। তক্তা বানিয়ে চালান দেয়ার ব্যবস্থা করে। পাহাড়ের গোড়ায় আবর্জনা যা জমে থাকে, পুড়িয়ে ফেলে।'

'সকাল বেলা কাজে বেরোনোর আগে কি কি করতে হয় কয়েদীদের?'

'প্রথমে জেলখানার উঠানে নাম ডাকা হয়। এক সারিতে দাঁড়ায় সব কয়েদী। তাদের ঘিরে রাখে সশস্ত্র প্রহরীরা। তারপর সারি ভেঙে দুটো সারি করা হয়। কাজ করার জন্যে নতুন কোন যন্ত্রপাতি নেয়ার প্রয়োজন হলে নিয়ে নেয় কয়েদীরা। গেট দিয়ে বেরিয়ে মার্চ করে এগোয় কয়লা পাহাড়ের দিকে।'

'এর কোন ব্যতিক্রম হয় না?'

'সাধারণত হয় না।'

'কাজের জায়গায় যাওয়ার পর কি হয়? কাজ করার কোন নির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন আছে?'

'নিয়ম-কানুন আর কি। দল ভেঙে দিয়ে যার যার কাজ বুঝিয়ে দেয়া হয়। অথবা যার যার আগের দিনের বাকি কাজ শেষ করে।'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'বুঝলাম। কাছে থেকে দেখতে চাইলে ওরা আসার আগেই গিয়ে কয়লার স্তূপের আড়ালে লুকিয়ে থাকতে হবে।'

সিগারেট টানা থামিয়ে দিল মিকোশা। 'বলো কি! মারাত্মক ঝুঁকি নেয়া হয়ে যাবে।'

'এখানে যা-ই করতে যাব না কেন, ঝুঁকি থাকবে। এই যে বসে আছি, এটা কি ঝুঁকি নয়? সেজন্যেই আমি চাইছি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাজ সেরে পালাতে। ভাবছি, আজ রাতেই পাহাড়টা দেখতে যাব। চাঁদের আলোয় ভাল করে দেখে আসব কোথায় কি আছে। এখন যতটা পারা যায় বিশ্রাম নিয়ে নেয়া দরকার। পালা করে একজনকে পাহারায় থাকতে হবে।'

চুপ করে গেল মিকোশা।

আলোচনা এখানেই শেষ হলো।

সূর্য ডোবার সামান্য আগে পাহারায় ছিল রবিন, ঘোষণা করল, একটা লঞ্চ দেখা যাচ্ছে। পেট্রল বোট। সাগরের দিক থেকে এসে মোহনা ঘুরে নদীতে ঢুকল লঞ্চটা। এগিয়ে আসতে লাগল তটরেখা ঘেঁষে।

রবিনের ডাক শুনে বেরিয়ে এল সবাই।

দেখেটেখে ওমর বলল, 'কোস্টাল পেট্রল বোট। কিছু খুঁজতে এসেছে। কি খুঁজতে এসেছে, তা-ও অনুমান করতে পারছি। মিকোশা, আপনাকে খুঁজছে ওরা। এমন একটা নৌকার তালাশে এসেছে, যেটাতে করে পালাতে চাইছেন আপনি। তারমানে সত্যি যদি নৌকায় করে পালানোর চেষ্টা করতেন, বেশিদূর যেতে পারতেন না। কোন নৌকাকেই এখন ভালমত না দেখে মোহনা পেরোতে দেবে না ওরা।'

'এ পাড়ের কাছে যে আসছে না, বাঁচা গেছে,' মুসা বলল।

জবাব দিল না ওমর। লঞ্চটার দিকে চোখ।

ওপাড় ধরেই এগোতে লাগল ওটা। কিছুদূর এগিয়ে একটা বাঁকের কাছে অদৃশ্য হয়ে গেল। এখান থেকে খুব বেশি দূরে নয় জায়গাটা। এঞ্জিনের আওয়াজ কানে আসছে। গাছের জটলার জন্যে দেখা যাচ্ছে না লঞ্চটা। নদীর তীরে দুটো জেলে ডিঙি বাঁধা। সূর্য অস্ত যাচ্ছে। কমলা আভা ছড়িয়ে পড়েছে পানিতে।

গাছের জটলার অন্য পাশ দিয়ে আবার বেরিয়ে আসতে দেখা গেল লঞ্চটাকে। এবার নদীর এপাশে চলে এসেছে, ওরা রয়েছে যে পাশটায়। সাড়া ফেলে দিল হাঁসের ঝাঁক। চিৎকার করতে করতে উড়াল দিল ওগুলো। গেল না। মাথার ওপর চক্কর দিয়ে দিয়ে ঘুরতে লাগল।

'এই ভয়টাই করছিলাম,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল ওমর। 'ওরা শুধু ওই পাড়ে খোঁজাখুঁজি করেই চলে যাবে না।'

'এখানে আসতে আসতে অবশ্য দেখার মত আলো আর থাকবে না,' কিশোর বলল। 'অন্ধকার তো প্রায় হয়েই গেছে। চরায় আটকে যাওয়ার ভয়ে তীরের বেশি কাছে আসতে চাইবে না।'

'হ্যাঁ, কিছু যখন করতে পারব না আমরা, জীবনটা ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দিয়ে বসে থাকা ছাড়া উপায় নেই।'

দ্রুত ক্ষয়িষ্ণু গোধূলির আলোয় এঞ্জিনের ধুক-ধুক ধুক-ধুক শব্দ তুলে এগিয়ে আসছে লঞ্চটা। কেবিনের কাঁচের জানালার ওপাশে হুইলের পেছনে দুজন মানুষকে দেখা গেল। গলুইয়ে আছে একজন। চতুর্দিকে নজর রাখছে সে। পেছনে আরও একজন, তার নজর শুধু তীরের দিকে।

নলখাগড়ার বেড়ার কাছাকাছি এসে এঞ্জিনের শব্দ বদলে গেল। যে ল্যাগুনে লুকানো রয়েছে বিমানটা তার কাছ থেকে পঞ্চাশ-ষাট গজ দূরে হবে। আরেকটু এগিয়ে ধীরে ধীরে থেমে গেল লঞ্চটা।

'দেখে ফেলল নাকি আমাদের!' গলা কাঁপছে মুসার।

'মনে হয় না,' জবাব দিল কিশোর। 'আলো একেবারেই নেই।'

ঝনঝন করে উঠল নোঙরের শিকল।

'হুঁ,' চিন্তিত ভঙ্গিতে ওমর বলল, 'তাহলে এখানেই রাত কাটানোর ইচ্ছে।

অন্ধকারে চলার ঝুঁকি নিতে চাইছে না।'

'একেই বলে যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধে হয়,' তিক্তকণ্ঠে বলল মুসা। 'নইলে নোঙর ফেলার আর জায়গা পেল না। একেবারে আমরা যেখানে···'

'হয়তো আমাদের মত একই কারণে এখানে নোঙর ফেলেছে ওরাও,' কিশোর বলল। 'বাতাসের ছোবল থেকে বাঁচার জন্যে। আস্তে কথা বলো। পানির ওপর শব্দ কিভাবে চলাচল করে জানো না।'

'আলো জ্বালতেও সাবধান,' ওমর বলল। 'ম্যাচট্যাচ কিচ্ছু জ্বালানো যাবে না। কোনভাবেই যেন আলো চোখে না পড়ে ওদের। আমরা যে এখানে আছি, ওরা জানে না। ভোর হলে, কিংবা চাঁদ উঠলেই চলে যাবে।'

'তা তো বুঝলাম,' মৃদুস্বরে বলল রবিন। 'কিন্তু আমাদের কয়লা পাহাড়ে যাবার কি হবে?'

'দাঁড়াও না, দেখি আগে, ওরা কি করে,' কিশোর বলল।

অস্বস্তিকর নীরবতা নামল বিমানের কেবিন জুড়ে।

সাত

সময় যাচ্ছে।

লঞ্চের রাইডিং লাইট জ্বেলে দেয়া হয়েছে। কেবিন থেকে হলদে আলোর সরু একটা চিলতে এসে তেরছা ভাবে পড়েছে পানিতে। নদীর ওপারে চোখে পড়ছে দু'একটা মিটমিটে আলো। মারকভের মত সেই সব হতভাগ্যদের কুঁড়ে, যাদের কাছে সুখ জিনিসটা সোনার চেয়ে দামী।

মাঝে মাঝে গুঞ্জনের মত কথার শব্দ ভেসে আসছে লঞ্চ থেকে। স্পষ্ট নয় একটা শব্দও। রবিনও বুঝতে পারছে না। পুরো ব্যাপারটাই অবাস্তব লাগছে তার কাছে। মুসার কাছে একঘেয়ে, বিরক্তিকর। কিশোরের কাছে উদ্বেগের, কারণ, যতক্ষণ লঞ্চটা থাকবে, আটকে বসে থাকা লাগবে ওদের, কিছুই করা যাবে না। ওমর আর মিকোশারও ভাল লাগছে না, এটা না যাওয়া পর্যন্ত একটা বিরাট দুশ্চিন্তা। আরও একটা কথা মনে হচ্ছে কিশোরের, কোন কারণে যদি লঞ্চ থেকে নেমে ওরা টহল দিতে চলে আসে এদিকে, টর্চ জ্বেলে দেখার চেষ্টা করে, তাহলে কি ঘটবে বলা মুশকিল!

মধ্যরাতের পর একটা নতুন শব্দ কানে এল লঞ্চ থেকে। বিমানের কেবিনে বসে যারা ঢুলছিল, চমকে জেগে গেল। রেডিও মোর্সের শব্দ।

ওই মোর্সের জন্যেই কিনা কে জানে, হঠাৎ পরোপরি জ্যান্ত হয়ে উঠল লঞ্চটা। নোঙর তোলা হলো। এঞ্জিন চালু হলো। অখণ্ড নীরবতার মধ্যে এ সব শব্দ বিস্ময়কর রকম বেশি হয়ে কানে বাজতে লাগল। চলতে আরম্ভ করল লঞ্চটা। নাক ঘুরে গেল। ঢেউয়ের দোলায় নলখাগড়ার বেড়াকে দুলিয়ে দিয়ে রওনা হয়ে গেল। কোনদিকে আর না তাকিয়ে সোজা চলে গেল মোহনার দিকে।

'উফ্, বাঁচলাম,' ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল রবিন।

লঞ্চটা যেদিকে গেল সেদিকে তাকিয়ে রইল কিশোর।

মুসা বলল, 'গর্তের বাইরে বেড়াল ওত পেতে থাকলে ইঁদুরের কেমন লাগে হাড়ে হাড়ে টের পেলাম আজ।'

সিগারেটের জন্যে প্রাণটা আইঢাই করছিল ওমরের, লঞ্চ থেকে আগুন দেখতে পাবে ভয়ে জ্বালাতে পারছিল না। সিগারেট ধরিয়ে মনের সুখে টান দিল সে। মিকোশা চেয়ারে হেলান দিয়ে ঘুমাচ্ছে। এতদিন পর শান্তি। তাই এত যে শব্দ, এত নড়াচড়া, কোন কিছুই তার ঘুমের ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারছে না।

চলে গেছে লঞ্চটা। আর এল না। দরজার কাছ থেকে ফিরে এল কিশোর। 'এবার বেরোনো যায়। পাহাড়টা গিয়ে দেখে আসা দরকার। আমার প্ল্যানটা কি, খুলে বলি। ওখানে গিয়ে যদি সুবিধামত একটা লুকানোর জায়গা পাই, যেখান থেকে মিলফোর্ড আঙ্কেলকে কাজ করতে দেখতে পাব, তাঁর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পাব, তাহলে সেখানে বসে যাব। তাঁকে জানিয়ে দেব, আমরা চলে এসেছি।'

'তার কি কোন দরকার আছে?' রবিনের প্রশ্ন।

'আগেও বলেছি, এখনও বলছি, আছে। তাঁর অজান্তে হঠাৎ করে কিছু করতে গেলে চমকে যাবেন। উল্টোপাল্টা কিছু করে বসলে ভালর চেয়ে খারাপ হবে। তারচেয়ে জানিয়ে রাখলে রেডি থাকবেন, আমাদের সহযোগিতা করতে পারবেন, পালাতে সুবিধে হবে।'

'কথা বলার পর ফিরবে কি করে?' জিজ্ঞেস করল ওমর।

'কয়েদীরা সব জেলখানায় ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত ফিরতে পারব না,' কিশোর বলল। 'এমনকি গার্ডদের সামনে নড়াচড়া করাও কঠিন হয়ে যাবে।'

'তারমানে সারাদিন আটকে থাকবে ওখানে!'

'আর কি করব। কফি আর বিস্কুট খেয়ে কাটিয়ে দিতে হবে। যাকগে, সেসব নিয়ে পরেও আলোচনা করা যাবে। এখন গিয়ে সরেজমিনে তদন্ত করা দরকার। লুকানোর জায়গা আছে কিনা, সেটাও তো বুঝতে হবে।'

'সঙ্গে কে কে যাচ্ছে তোমার?' জানতে চাইল মুসা। 'নিশ্চয় রবিন?'

'প্রথমত, মিকোশা যাচ্ছেন। কারণ জায়গাটা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখানোর জন্যে তাঁকে প্রয়োজন আছে আমার।'

'আমি রাজি,' বলে উঠল মিকোশা। কখন ঘুম ভেঙেছে তার, কেউ লক্ষ করেনি। জেগে উঠে ওদের কথা শুনছিল।

হেসে তার দিকে মাথা ঝোঁকাল কিশোর। 'রবিনকে নিতেই হচ্ছে। দোভাষীর কাজ চালানোর জন্যে। আমার সঙ্গে লুকিয়ে বসতেও তাকে অনুরোধ করব। আমি চাই, ওর বাবার সঙ্গে কথাবার্তাটা সে নিজেই চালাক।'

'আর ওমর ভাই?' মুসা জিজ্ঞেস করল।

'তাকে তো প্লেনে থাকতেই হবে। প্লেন পাহারা দেয়ার জন্যে। এটার কিছু হয়ে গেলে প্রাণ বাঁচানোই দায় হয়ে যাবে আমাদের। কিংবা হয়তো দেখা যাবে কয়েদী কমাতে এসে শাখালিন কারাগারের কয়েদীর সংখ্যা আরও বাড়িয়ে ফেললাম। এখন বেরিয়ে গিয়ে আমাদের যদি কিছু হয়, কোন বিপদে পড়ি, ফিরতে না পারি, ওমর ভাই যা ভাল বোঝে তা-ই করবে।'

'আর আমার কি কাজ?'

'তুমি ওমর ভাইকে সঙ্গ দেবে।'

'অ, আমি তাহলে একটা বাতিল জিনিস!' ফুঁসে উঠল মুসা। 'ওসব হবেটবে না। শুধু শুধু বসে থাকতে আমি পারব না। আমিও তোমাদের সঙ্গে যাচ্ছি। একজন বাড়তি লোক থাকলে অনেক উপকার পাবে।'

'ঠিক আছে, যেতে চাইলে চলো,' আপত্তি করল না কিশোর। 'নৌকা বাওয়ার জন্যেও তো কাউকে দরকার। তুমি আমাদের পারাপারের মাঝি।' মুচকি হেসে উঠে দাঁড়াল সে। 'সবাই ওভারকোট পরে নাও।'

যার যার ওভারকোট পরে নিল রবিন আর মুসা। মিকোশা গায়ে চড়াল মারকভের দেয়া উদ্ভট পোশাকটা। দেখতে খারাপ হলেও জিনিসটা কাজের, তার প্রমাণ পেয়ে গেছে সে। খুব গরম। আর জেলখানার বিশ্রী পোশাকটাও তাতে ঢাকা যায়।

ডিঙিতে করে তীরে পৌঁছল ওরা। নামার আগে ভালমত দেখে নিল কেউ নজর রাখছে কিনা। নির্জনই মনে হলো। একে একে তীরে নামল সবাই। ডিঙির দড়ি শক্ত করে গাছের সঙ্গে বাঁধল মুসা।

এক সারিতে রওনা হলো ওরা। আগে আগে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল মিকোশা। সবার শেষে রয়েছে মুসা। মাঝে মাঝে পেছন ফিরে দেখে নিচ্ছে সে, কেউ অনুসরণ করছে কিনা। ধীরে ধীরে এগোচ্ছে ওরা, তাড়াহুড়ো নেই। বনের কিনার ঘেঁষে চলেছে, যাতে বিপদের সামান্যতম সম্ভাবনা দেখলেই ডাইভ দিয়ে লুকিয়ে পড়তে পারে গাছপালার আড়ালে। খানিক পর পরই থামছে। কান পেতে শুনছে কোন শব্দ আছে কিনা। এ রকম প্রতিকূল পরিবেশে, অচেনা অঞ্চলে স্নায়ু সব সময় টানটান হয়ে থাকে। কাজেই আচমকা ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে একটা ভালুক যখন ঝোপঝাড় ভেঙে দৌড়ে পালাল, বুকের মধ্যে ধড়াস করে উঠল সবার। প্রাণীটার পাহাড়ের দিকে ছুটে যাওয়ার শব্দ বহুক্ষণ ধরে শোনা যেতে থাকল।

চলতে চলতে নাকে এল কাঠ-পোড়া গন্ধ। দাঁড়িয়ে গেল কিশোর। সবাই কাছে এলে ফিসফিস করে বলল, 'মারকভের কুঁড়ে পুড়ছে, কোন সন্দেহ নেই। সামনের মোড়টার পরেই। ও এখনও আছে নিশ্চয়। চলো, দেখা যাক।'

এগিয়ে চলল আবার। আগের চেয়ে আরও সাবধান। গাছের ফাঁক দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখল ছাই হয়ে গেছে কুঁড়েটা। কথামতই কাজ করেছে মারকভ। কিশোর লক্ষ করল মরে পড়ে থাকা গার্ডের লাশটা নেই।

ছাইয়ের গাদায় এখনও ধিকিধিকি আগুন। মারকভকে দেখা গেল না। পা বাড়াতে যাবে আবার ওরা, এই সময় ফতফত শব্দ হলো।

বরফের মত জমে গেল যেন সবাই। ঘোড়ার মাথা ঝাঁকি দেয়াতে লাগাম নাড়ার শব্দ। একবারই হলো। আর কোন শব্দ নেই। কোনখান থেকে এল তা-ও বোঝা গেল না। ফাঁকা জায়গাটাকে ঘিরে আছে গাছের কালো দেয়াল। গাছের ডাল মাথার ওপরে এত ঘন চাঁদোয়া তৈরি করেছে, চাঁদের আলো সামান্যতম ঢুকতে পারছে না তার মধ্যে। গভীর কালো একটা গর্তের মত লাগছে জায়গাটাকে, ওরা রয়েছে গর্তের তলায়। এখানে আলো বলতে শুধু পোড়া ছাইয়ের মাঝে নিভে আসা

আগুন। চারপাশে তার লালচে আভা।

নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কিশোর। তার সঙ্গে বাকি সবাই। বুঝতে পারছে একটা ঘোড়া রয়েছে কাছেপিঠে কোথাও। লাগামের শব্দ, পিঠে সওয়ারি আছে। মারকভের ঘোড়া নেই, সওয়ারি মানেই শত্রু।

সেকেন্ড কাটছে। সেকেন্ড থেকে মিনিট। অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থেকে থেকে চোখ ব্যথা করে ফেলল কিশোর। স্নায়ুর ওপর প্রচণ্ড চাপ পড়ছে। অপেক্ষা করার সুফল মিলল অবশেষে। কথা বলে উঠল একটা লোক। স্পষ্ট, ধারাল গলা। গাছের কালো দেয়ালের পটভূমিতে অস্পষ্ট ছায়ার নড়াচড়া দেখা গেল। খোলা জায়গায় বেরিয়ে এল দুজন ঘোড়সওয়ার। ছাইয়ের স্তূপের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে চলে গেল গাছপালার ভেতর দিয়ে নদীর পাড়ের পথটার দিকে।

খুরের মৃদু খট খট আর জিনের খচমচ শব্দ দূরে পুরোপুরি মিলিয়ে যাবার পর কথা বলল কিশোর। রবিনকে জিজ্ঞেস করল, 'কি বলল ওরা বুঝতে পেরেছ?'

'হ্যাঁ। বলল এখানে অপেক্ষা করে আর লাভ নেই। ও ফিরে আসবে না।'

'মারকভের কথা বলল?'

'সে-রকমই তো মনে হলো। আর কার কথা বলবে?'

'শুধু মারকভকেই নয়, মিকোশাকেও খুঁজে বেড়াচ্ছে ওরা,' কিশোর বলল। 'এ থেকেই বোঝা যাচ্ছে কতটা সাবধান থাকতে হবে আমাদের। কি বাঁচাটা বেঁচেছি! আরেকটু হলেই ওই কসাক দুটোর সামনে পড়ে গেছিলাম। তবে এখন মনে হয় আমরা নিরাপদ।'

নদীর পাড়ের রাস্তা ধরে হেঁটে চলল ওরা। সাবধানতায় ঢিল পড়েনি, বরং বেড়েছে। পুরো ব্যাপারটাই কেমন অবাস্তব লাগছে মুসার কাছে। মনে হচ্ছে, বাস্তবে নয়; স্বপ্নে ঘটছে এ সব ঘটনা। কিছু বলল না। হেঁটে চলল চুপচাপ।

কিছুক্ষণ পর আবার যখন বনে ঢুকল মিকোশা, ফের অস্বস্তিতে পড়ে গেল সবাই। রাস্তা ধরে না গিয়ে বনের ভেতর দিয়ে ঘুরে যেতে চায় মিকোশা। এই সাবধানতার অবশ্য প্রয়োজন আছে। কে কোনখানে ঘাপটি মেরে রয়েছে, বোঝার উপায় তো নেই।

নদীর বেশ কিছুটা উজানে আবার বন থেকে বেরিয়ে এল ওরা। নদীটা এখানে সরু। চওড়া খুব কম।

বরফ শীতল পানি ভেঙে ওপারে যাওয়ার কথা ভাবতেই দমে গেল কিশোর। দুশ্চিন্তা দূর হলো রবিনের কথায়। বলল, সামনে একটা ছোট ব্রিজ আছে। মনে পড়ল, মারকভও বলেছিল ব্রিজ আছে। মিকোশা জানাল, আরও খানিকটা সামনে গেলেই পাওয়া যাবে।

নদীর সবচেয়ে সরু অংশে তৈরি করা হয়েছে ব্রিজটা। ব্রিজের কাছ থেকে সামান্য দূরে নদীর সেই অগভীর জায়গাটা, যেখান দিয়ে দৌড়ে পালিয়েছিল মিকোশা। তবে ব্রিজের নিচে নাকি পানির গভীরতা যথেষ্ট বেশি, জানাল সে। বহু পুরানো ব্রিজ। পুরানো হতে হতে কালো হয়ে গেছে তক্তাগুলো। নড়বড়ে হয়ে আছে বহু জায়গায়। মেরামতের প্রয়োজন ছিল আরও অনেক দিন আগেই। অবস্থা দেখে

মনে হয় উঠলেই ভেঙে পড়বে। মিকোশা বলল, ওই ব্রিজ কাউকে ব্যবহার করতে দেখেনি সে। নদী পারাপারের প্রয়োজন হলে নৌকা ব্যবহার করে থাকে জেল থেকে ছাড়া পাওয়া কয়েদীরা।

ব্রিজটা ভালমত পরীক্ষা করে দেখল কিশোর। কারণ অন্যপাশ থেকে পালাতে গেলে এই ব্রিজই ভরসা। তাড়াহুড়োয় কোনখানে পা দিলে পা ভাঙবে, কিংবা পানিতে পড়ে আধমরা হবে, জেনে রাখা দরকার। মাঝে মাঝেই ফাঁকা, তক্তা খসে পড়ে গেছে। দুটো খুঁটি ভেঙে যাওয়ায় পুরো ব্রিজটাই সামান্য কাত হয়ে আছে একপাশে।

সবাই একসঙ্গে ব্রিজে উঠতে ভরসা পেল না। একজন একজন করে পেরোতে শুরু করল। কিশোর দেখল, সামান্য ঝাঁকি লাগলেও দুলে ওঠে ব্রিজটা। পানিতে পড়ে ডুবে মরার ভয় সে করছে না, কিন্তু সাঁতরে পাড়ে উঠতে পারলেও ভেজা কাপড়ে এই শীতের মধ্যে টেকা কঠিন হয়ে যাবে।

যাই হোক, কোন অঘটন ঘটল না। নিরাপদেই ব্রিজ পেরিয়ে এল সবাই। চাঁদের ঠাণ্ডা আলোয় পথ দেখে তিনশো গজ দূরের কয়লা পাহাড়টাতে এসে পৌঁছাল। ওরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, তার সামনে দিয়ে চলে গেছে জেলখানা থেকে আসা পায়েচলা পথটা। আকাশের পটভূমিতে চারকোনা বিশাল একটা আস্ত পাথরের মত লাগছে জেলখানাটাকে।

'এটাই সেই জায়গা,' পাহাড়টা দেখিয়ে মিকোশা বলল।

'চোখ খোলা রাখো,' দুই সহকারীকে নির্দেশ দিল কিশোর। 'আমি একটু ঘুরে দেখি।'

সময় নিয়ে প্রথমে পুরো জায়গাটায় চোখ বোলাল সে। তারপর আস্তে আস্তে হেঁটে চলল যেখানে মূল কাজ হয়, সেখানটাতে। তন্নতন্ন করে অঞ্চলটাকে খুঁটিয়ে দেখল সমস্ত অ্যাঙ্গেল থেকে। নিঃসঙ্গ পতিত যে জমিটাতে ঝোপ-জঙ্গল হয়ে আছে, সেটাও বাদ দিল না। গুচ্ছে গুচ্ছে জন্মে রয়েছে এক ধরনের বেঁটে বার্চ গাছ। নদীর সমান্তরালে চলে গেছে সারি দিয়ে, মাঝে মাঝে ফাঁক। আঙুল তুলে দেখিয়ে কিশোর বলল, 'কাজে লাগতে পারে।'

জেলখানা আর কর্মক্ষেত্রের মাঝখানের পাহাড়টায় জন্মে আছে খসখসে, জট পাকানো রোডোডেনড্রন। মাঝে মাঝে মাথা তুলে রেখেছে কেটে ফেলা গাছের গোড়া। মরা ডালপাতা বিছিয়ে আছে। এগুলো মাড়িয়ে আসা কঠিন বলেই জেলখানা থেকে সরাসরি সোজা পথে না এসে পাহাড়ের গোড়া দিয়ে ঘুরিয়ে আনা হয় কয়েদীদের।

'আগুন লাগলে বারুদের মত জ্বলে উঠবে এই জিনিস,' আনমনে মন্তব্য করল কিশোর।

'আগুন লাগানোর কথা ভাবছ নাকি!' বলল বিস্মিত মিকোশা।

'আপাতত লাগাচ্ছি না। তবে সব রকম চিন্তা মাথায় রাখা ভাল। কখন কোনটা কাজে লেগে যাবে বলা তো যায় না। পাহাড়টাতে যদি আগুন ধরিয়ে দেয়া যায়, প্রচুর ধোঁয়া তৈরি হবে।'

কয়লা পাহাড়ের সামনে গিয়ে দাঁড়াল ওরা। পাহাড়ের গায়ে প্রায় সিকি মাইল

লম্বা জায়গার মাটি খসিয়ে ফেলা হয়েছে। বেরিয়ে আছে কয়লা। বড় বড় খোঁড়ল তাতে। কেটে কেটে কয়লা নামানো হয়েছে ওসব জায়গা থেকে। গোড়ার মাটি শ্রমিকদের ক্রমাগত পদচারণায় দলিত-মথিত, কাদা হয়ে আছে। বড় বড় টুকরো করে স্তূপ দিয়ে দিয়ে সাজিয়ে রাখা হয়েছে কয়লা। ঠেলাগাড়ি, গাঁইতি, শাবল, বেলচা, কোদাল ছড়িয়ে পড়ে আছে এখানে ওখানে। দিনের কাজ শেষে ফেলে রেখে গেছে কয়েদীরা; আগামী দিন এসে তুলে নিয়ে আবার কাজ করবে। খানিক দূরে ফার বন।

'শেষবার ঠিক কোনখানে কাজ করে গেছেন আপনি?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'ওইখানে,' হাত তুলে দেখাল মিকোশা। 'বেলচা দিয়ে কয়লা তুলেছি।'

'আর মিলফোর্ড আঙ্কেল?'

'ওই যে ওখানে,' আবার হাত তুলে দেখাল মিকোশা।

'তিনি কি করছিলেন?'

'ওই যে ওখানে যে বিরাট স্তূপটা আছে, সেটা থেকে কয়লা নিয়ে ঠেলাগাড়িতে করে ওই ওদিকে,' উল্টো দিকে কিছুদূরের আরেকটা জায়গা দেখাল মিকোশা, 'নিয়ে গিয়ে সাজিয়ে রাখছিলেন।'

'আপনি যা করছিলেন, পরের দিন এলেও কি সেই একই কাজ করতে দেয়া হত আপনাকে?'

'হ্যাঁ।'

'এত শিওর হচ্ছেন কি করে?'

'কারণ আমাদের যার যার যন্ত্রপাতি যেখানে কাজ করতাম, সন্ধ্যায় ফেরার সময় সেখানেই রেখে যেতে বলা হত। আমি ইচ্ছে করেই আজ সকালে কাজে লাগার কথা বলে বেলচাটা নিয়ে নিয়েছিলাম।'

'কারণ আপনার উদ্দেশ্য ছিল পালানো,' হাসল কিশোর। 'গার্ডদের পাহারা দেয়ার নিয়ম কি?'

'দু'তিনজন করে করে পাহাড়ের ওপর থেকে নিচে বার বার টহল দেয়। বনের দিকে যাতে কেউ ছুটে পালাতে না পারে সেদিকে কড়া নজর রাখে।'

কয়লার বড় একটা স্তূপের কাছে এসে দাঁড়াল কিশোর। অনেক চওড়া, কয়েক ফুট উঁচু লম্বা একটা দেয়ালের মত হয়ে আছে স্তূপটা।

'আপনি যা বললেন,' বলল সে, 'তাতে বুঝলাম, এই স্তূপ থেকে কয়লা নিয়েই ওদিকে সাজিয়ে রাখতে যান মিলফোর্ড আঙ্কেল।'

'হ্যাঁ। গাড়ি ভর্তি করে নিয়ে গেছেন, খালি গাড়ি নিয়ে ফিরে এসেছেন; বার বার একই কাজ।'

'গুড।' পেছনের পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবল কিশোর। খানিকটা সরে গিয়ে হাত নেড়ে মুসা আর রবিনকে আসার ইঙ্গিত করল। ওরা এলে পাহাড়টা দেখিয়ে বলল, 'এখানে লুকানোর জায়গা আছে।'

'বলো কি!' মুসা অবাক। 'কোথায়?'

'দেখছ না কি সুন্দর একটা খোঁড়ল বানিয়ে রেখেছে, যেন আমাদের লুকানোর জন্যেই। এতে ঢুকে বসব আমি আর রবিন। তোমরা আমাদের সামনে কয়লা রেখে

দেয়াল তুলে দেবে, যাতে বাইরে থেকে আমাদের দেখা না যায়। ছোট ছোট ছিদ্র রাখবে, যাতে বাইরেটা দেখতে পারি আমরা।'

'পাগল নাকি! এত এত গার্ড, এত কয়েদী—কারও না কারও চোখে নিশ্চয়ই পড়ে যাবে।'

'জেলখানায় ঢুকে বের করে আনার চেষ্টা করার চেয়ে এটা বরং অনেক সহজ কাজ, ঝুঁকিও কম। বলতে পারো, বসে আরাম পাব না মোটেও; কিন্তু মিলফোর্ড আঙ্কেলের সঙ্গে কথা বলার জন্যে এরচেয়ে সুবিধেজনক জায়গা আর একটাও নেই। কাজ করার জন্যেই তো আসতে চেয়েছিলে,' হাসল কিশোর, 'কাজ দিয়ে দিলাম। এত কথা বলছ কেন?'

খোঁড়লটায় গিয়ে ঢুকল কিশোর।

তাতে ঢুকে বসল কিশোর।

মিকোশা বলল, 'বাহ, ভাল জায়গাই তো বেছেছ, দেখতে পাচ্ছি না। সামনে দেয়াল তুলে দিলে একেবারেই দেখা যাবে না। মাথার ওপর কয়লার ছাত। পাহাড়ের ওপর থেকেও তোমাদের দেখতে পাবে না গার্ড।...নাহ, কিশোর, স্বীকার করতেই হচ্ছে, নজর আছে তোমার।...মিস্টার মিলফোর্ড অবশ্য তোমাদের অনেক প্রশংসা করেছেন...'

মিকোশাকে থামানোর জন্যে কিশোর বলল, 'রবিন, ঢুকে পড়ো।'

কিশোরের পাশে এসে বসল রবিন।

দুজনের সামনে কয়লার দেয়াল তুলে দিল মুসা আর মিকোশা। বেছে বেছে সমান টুকরো তুলে নিয়ে সুন্দর করে সাজিয়ে রাখল, ট্যাড়া-বাঁকা রাখলে ধসে পড়ার ভয় আছে। খোঁড়লটা ঢেকে দিল এমন করে, যাতে সহজে বোঝা না যায়। এখানে যে একটা খোঁড়ল ছিল, সেটা গার্ডদের খেয়াল না থাকলে কিছু ধরতেই পারবে না ওরা।

সাগরের দিক থেকে বয়ে গেল বরফের মত শীতল এক ঝলক বাতাস। ক্ষুরের মত ধারাল। ওপরের ফাঁক দিয়ে আকাশের দিকে তাকাল কিশোর। চাঁদের মুখ ঢেকে দিচ্ছে পাতলা এক টুকরো মেঘ।

'আকাশের অবস্থা ভাল না,' বলল সে। 'বাতাস আসছে পুব থেকে, সোজা মোহনার মধ্যে ঢুকছে। মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে অবস্থা। যাকগে, সেটা নিয়ে পরে ভাবা যাবে। আগের কাজ আগে।'

'আমি থাকব?' জিজ্ঞেস করল মিকোশা।

'না। বেশি লোক বরং ঝামেলা বাড়াবে। আপনাদের আর অপেক্ষা করার দরকার নেই। চলে যান। ওমর ভাইকে বলবেন, কাল সন্ধ্যার পর দেখা হবে।'

'আচ্ছা।...সাবধানে থেকো তোমরা।'

'থাকব। ধন্যবাদ।'

যেতে মন চাইছে না মুসার। কিন্তু থাকার উপায় নেই। অনিচ্ছা সত্ত্বেও মিকোশার সঙ্গে পা বাড়াল সে।

টুকটাক কথা বলতে লাগল কিশোর আর রবিন। সতর্ক রইল, কেউ এসে যাতে আবার শুনে না ফেলে।

ভোর হয়ে এল। পুব আকাশে ফ্যাকাসে আলো দেখা দিতে বিস্কুটের প্যাকেট ছিঁড়ে বিস্কুট বের করল কিশোর। ফ্লাস্ক থেকে চা ঢেলে নিল। রবিনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'সময় থাকতে নাস্তাটা সেরে ফেলো। ওরা এসে গেলে আর পারা যাবে না। নড়াচড়া একদম বন্ধ।'

আট

সকালের শীতল আলোয় আসতে দেখা গেল ওদের। পায়ের শব্দ ছাড়াও আরেকটা শব্দ কানে এল কিশোরের, প্রথমে চিনতে পারল না। গুরুত্ব দিল না তেমন।

কিন্তু দলটা কাছে আসতেই সারির সামনের লোকগুলোর হাঁটার ভঙ্গি দেখে বুঝে ফেলল ঘটনাটা কি। কিসের শব্দ তা-ও বুঝল।

শিকল!

'সর্বনাশ!' দম নিতে কষ্ট হচ্ছে যেন। 'শিকল বেঁধে নিয়ে এসেছে! দিল আমাদের প্ল্যান ভণ্ডুল করে।'

'আর যাতে পালাতে না পারে,' তিক্ত কণ্ঠে বলল রবিন। 'পায়ে শিকল বাঁধা থাকলে দৌড়াতে পারবে না।'

চুপ হয়ে গেল কিশোর। এ রকম কিছু ঘটবে, কল্পনাই করেনি। রবিনের কথা ঠিক। পায়ে আঠারো ইঞ্চি শিকল নিয়ে হাঁটা যায়, কিন্তু দৌড়ানো সম্ভব নয়। পালাবেন কি করে মিস্টার মিলফোর্ড?

ছয় জন প্রহরী আছে বন্দিদের সঙ্গে। দুজন গেল কয়লা পাহাড়ের ওপর দিকে, যেখান থেকে বন্দিদের ওপর ভালমত নজর রাখা যায়। পাহাড়টা কিছুটা বাঁকা বলে খোঁড়লে বসে ওপরে তাকিয়ে ওদের দেখতে পাচ্ছে কিশোররা। বাকি চারজন প্রহরী রয়ে গেল নিচে, একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব পর পর।

'কি হয়েছে বুঝতে পারছি,' কিশোর বলল। 'গার্ডেরা বেশির ভাগ চলে গেছে মিকোশাকে খুঁজতে। গার্ডের সংখ্যা কমে যাওয়ায় কয়েদীদের আটকে রাখার জন্যে পায়ে শিকল লাগিয়ে দিয়েছে। শিকল থাকায় কেউ আর পালানোর চেষ্টা করতে পারবে না।'

'এ ভাবে কাজ করবে কি করে ওরা?'

'জানি না। তবে আমার মনে হয় না আজ আর কেউ পালানোর চেষ্টা করবে। কিন্তু সেটা তো কথা নয়, কথা হলো তোমার বাবার পায়েও শিকল আছে। সমস্যাটার সমাধানের কোন উপায় এখনও দেখতে পাচ্ছি না আমি।'

'ওই যে, আসছে! খোদা!' আবেগে গলা ধরে এল রবিনের। 'দেখো না অবস্থাটা কি হয়েছে!'

দেখল কিশোর। এত পরিচিত লোকটাকেও অচেনা লাগল। লম্বা লম্বা চুল ঘাড়ের সঙ্গে লেপ্টে রয়েছে। বহুদিন শেভ নেই। দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল হয়ে আছে। কপালে গভীর ভাঁজ। পরনের পোশাকটা শতচ্ছিন্ন। কতদিন ধোয়া হয়নি কে জানে। সামনে ঝুঁকে কুঁজো হয়ে ঠেলাগাড়ির হাতল ধরে ঠেলে নিয়ে চলেছেন।

দাঁতে দাঁত চেপে বলল কিশোর, 'জেলের এই গার্ডগুলো মানুষ না, পিশাচ! মানুষ হলে এ রকম করে কষ্ট দিতে পারে?'

'মানুষরাই মানুষকে কষ্ট দিতে পারে,' পানি চলে এসেছে রবিনের চোখে। 'শুনেছি, সবচেয়ে শয়তান লোকগুলোকে পাঠানো হয় শাখালিনে। সাইবেরিয়ার চেয়ে খারাপ জায়গা এটা। ভাল মানুষ আসতে যাবে কেন?'

'ভেবো না, রবিন,' দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলল কিশোর, 'আঙ্কেলকে আমরা মুক্ত করবই।'

চিৎকার করে হুকুম দিতে শুরু করল প্রহরীরা। কাজ শুরু হলো কয়েদীদের। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর। আগের দিন যেখানে কাজ করতে দেয়া হয়েছিল মিস্টার মিলফোর্ডকে, আজও সেখানেই করছেন। কয়লার স্তূপ থেকে কয়লা তুলে ঠেলাগাড়ি বোঝাই করছেন। নিয়ে গিয়ে জমা করছেন অন্যখানে।

'এখন কিছু বোলো না,' রবিনকে সাবধান করল কিশোর। 'আরও কাছে এলে—আমাদের সামনে দিয়ে যখন যাবেন, তখন।'

'তুমি বলবে, না আমি?'

'তুমিই বলো।'

'প্রথমবার যাওয়ার সময়ই?'

'হ্যাঁ। বেশি কথা বলতে যেয়ো না। শুধু জানাও, আমরা এসেছি।...আমি নজর রাখছি গার্ডের দিকে। কিছু সন্দেহ করে কিনা বোঝার চেষ্টা করব।'

সবচেয়ে কাছের প্রহরীটা দাঁড়িয়ে আছে বিশ-পঁচিশ গজ দূরে কয়েকজন বন্দির কাছে। শাবল, বেলচা আর গাঁইতি দিয়ে কাজ করতে গিয়ে এত শব্দ করছে সবাই—কিশোর ভাবছে—ভালই হলো, কথা বললে প্রহরীর কানে যাওয়ার সম্ভাবনা কম। পাহাড়ের ঢালে টহল দিচ্ছে আরেকজন প্রহরী, কয়লার গা থেকে মাটি খসিয়ে নেয়া হয়েছে যেখানে।

এগিয়ে চলল কাজ। ঠেলাগাড়িতে কয়লা বোঝাই করে হাতল ধরে নিয়ে ঠেলে ঠেলে এগোলেন মিস্টার মিলফোর্ড। বেশ শক্তি লাগছে ঠেলতে, কষ্ট হচ্ছে, কারণ নরম মাটিতে বসে যাচ্ছে ঠেলাগাড়ির লোহার চাকা। রবিনদের খোঁড়লটার একেবারে সামনে দিয়ে এগোলেন।

সময় হয়েছে। প্রহরীদের দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর।

'থেমো না, বাবা,' বলে উঠল রবিন। 'আমরা এসেছি তোমাকে নিয়ে যেতে। আবার যখন এদিক দিয়ে যাবে, আবার কথা বলব।'

চলে গেলেন মিস্টার মিলফোর্ড।

কিশোরের দিকে তাকাল রবিন। ফিসফিস করে বলল, 'শুনতে পাওয়ার কোন লক্ষণই দেখাল না তো।'

'নিশ্চয় শুনেছেন। চালাক মানুষ। গার্ডদের সন্দেহ জাগাতে চান না। ফিরে যাওয়ার সময় আবার বোলো, তাহলেই বুঝতে পারবে। গার্ডদের দিকে নজর আছে আমার। কিছু টের পায়নি ওরা।'

'কি বলব?'

'বলো, ওমরভাই আমাদের সঙ্গে এসেছে।'

ফিরে এলেন মিস্টার মিলফোর্ড। রবিন বলল, 'ওমরভাই প্লেনে করে নিয়ে এসেছে আমাদের। তোমাকে নিতে এসেছি। তবে আজ পারব না।'

প্রহরীদের দিক থেকে পলকের জন্যে চোখ ফেরাল কিশোর, দেখল সামান্য মাথা ঝাঁকালেন মিস্টার মিলফোর্ড। রবিনের কথা শুনতে পেয়েছেন।

'এবার ফিরলে জিজ্ঞেস করবে,' কিশোর বলল, 'ওরা কি সব সময়ের জন্যে শিকল পরানোর ব্যবস্থা করেছে, নাকি খুলে দেবে। আর শিকলটা লোহার, না ইস্পাতের।'

প্রশ্নটা করা হলো। জানা গেল, লোহার শিকল। কবে খুলে দেয়া হবে, আদৌ হবে কিনা, জানেন না তিনি।

'এরপর?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'বলো, কাল পরিস্থিতি ঠিক থাকলে তাঁকে নিয়ে পালানোর চেষ্টা করব আমরা। ঠিক ক'টার সময়, বলা যাচ্ছে না। তবে কাল যেন তৈরি থাকেন। মিকোশা আমাদের সঙ্গে আছে, এ কথাটাও তাঁকে জানিয়ে দাও।'

জানানো হলো। এই প্রথম কথা বললেন তিনি, 'বাড়ি চলে যাও। আমার পায়ে শিকল। এ অবস্থায় পালাতে পারব না।'

'সেটা আমাদের ওপর ছেড়ে দিন,' জবাব দিল কিশোর।

বিচিত্র উপায়ে এই আলোচনা চলতে থাকল অনেকক্ষণ ধরে। টহল দিতে দিতে কোন একজন গার্ড যখন কাছে চলে আসে, তখন কথা বন্ধ থাকে। একবার একজন গার্ড কাজ কেমন চলছে দেখার জন্যে কাছে এসে দাঁড়াল। একেবারে খোঁড়লটার সামনে পেছন দিয়ে দাঁড়াল সে। এত কাছে, হাত বাড়ালে ছুঁতে পারে কিশোর। সবচেয়ে উদ্বেগের মুহূর্তটা এল, যখন সিগারেট ধরিয়ে জ্বলন্ত দিয়াশলাইয়ের কাঠিটা খোঁড়লের কাছে আবর্জনার ওপর ছুঁড়ে ফেলল প্রহরী। আগুন বেড়ে যাওয়ার আগেই পা দিয়ে মাড়িয়ে নিভিয়ে ফেলল। কিন্তু খোঁড়লে ধোঁয়া যা ঢুকে যাওয়ার ঢুকে গেছে। অনেক কষ্টে কাশি ঠেকাল কিশোর আর রবিন। এই সময় একটা বাঁশি বাজল। সরে চলে গেল লোকটা। হাঁপ ছেড়ে বাঁচল দুই গোয়েন্দা।

বাঁশি বাজানোর মানে কয়েদীদের দুপরের খাবার সময় হয়েছে। কালো রুটির একটা করে টুকরো আর এক ফালি শুকনো মাছ, ব্যস, এই হলো খাবার। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেতে হলো। তারপর কাজে ফিরে গেল আবার যার যার জায়গায়।

আধঘণ্টার জন্যে বিরতি দেয়া হয়েছিল। এই সময়টাতে বসে কপাল কুঁচকে, নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে কাটতে ভাবনায় নিমগ্ন থেকেছে কিশোর। রবিনকে বলল, 'শিকলগুলোই সমস্যাটা তৈরি করল। শিকলের কথা ভাবিইনি। কোনভাবে তোমার বাবার পা থেকে ওগুলো খুলতে হবে আগে।'

'কি করে খুলবে, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। একটা লোহাকাটা করাত ছুঁড়ে দিতে পারি। কিন্তু কাটতে গেলে গার্ডের চোখে পড়ে যাবে।'

'খোলা জায়গায় বসে কাটতে থাকলে তো পড়বেই।'

'তাহলে কোথায় বসে কাটবে?'

'এখানে।'

অবাক হয়ে কিশোরের মুখের দিকে তাকাল রবিন, 'কি বলছ? এই খোঁড়লের

মধ্যে আমাদের সঙ্গে বসে?'

'আমাদের নয়, তোমার সঙ্গে বসে।'

'সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়ে যাবে।'

'পড়বে না, যদি কেউ তাঁর জায়গায় কাজ করে।'

'কে?'

'আমি।'

'তোমার মাথা খারাপ হলো নাকি! তুমি যে কয়েদী নও ওরা বুঝবে না?'

'না বুঝবে না, যদি কয়েদীর পোশাক পরনে থাকে।'

'বাবার সঙ্গে পোশাক বদলানোর সময়ই পাবে না তুমি।'

'তাঁর সঙ্গে তো বদলাতে যাচ্ছি না আমি। মিকোশার পরনে কয়েদীর পোশাক আছে। সেটা থেকে মুক্তি পেয়ে খুশিই হবে সে। আমি আঙ্কেলের জায়গায় কাজ করতে থাকব, এই সুযোগে তোমরা দুজনে বসে শিকলটা কেটে ফেলবে। লোহার শিকল। কাটতে সময় লাগবে না।'

কিশোরের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে রবিন। 'আমি জানতাম বুদ্ধি একটা তুমি ঠিকই বের করে ফেলবে। কোন সমস্যাই তোমার কাছে সমস্যা হবে না।'

'বুদ্ধিটা এখন কাজে লাগলেই হয়।...একটা কথা ভাবছি। তবে সেটা অনেকখানিই নির্ভর করবে আবহাওয়া ভাল থাকার ওপর।'

'কি কথা?'

'পরে বলব। ব্যাপারটা নিয়ে আরও ভাবতে হবে।...ওই যে, আঙ্কেল আবার আসছেন। তাঁকে বলো, কাল আবার আসব আমরা।'

কথাটা জানিয়ে দিল রবিন। বাবাকে অনেক কথাই বলার আছে, কিন্তু এ মুহূর্তে কোন কথা বলতে পারল না। অত সুযোগ নেই।

খোঁড়লে বরফের মত শীতল হাওয়া ঢুকছে ফোকর দিয়ে। জবুথবু হয়ে বসে সময় গুনতে থাকল দুজন—কখন সন্ধ্যা নামবে, অন্ধকার হবে, প্রহরীরা চলে যাবে।

অবশেষে বহু যুগ পরে যেন ছায়া নামল গোধূলির। বন্দিদেরকে জড়ো করা হলো এক জায়গায়। গোণা হলো গরু-ছাগলের মত। তারপর মার্চ করিয়ে নিয়ে রওনা হলো জেলখানায়।

এক ভাবে বসে থাকতে থাকতে পা আড়ষ্ট হয়ে গেছে কিশোর আর রবিনের। উঠে দাঁড়াতেই কষ্ট হলো। কয়লা সরিয়ে খোঁড়ল থেকে বেরিয়ে এসে নানা রকম কসরত করে দূর করতে হলো আড়ষ্টতা। সুন্দর করে আবার কয়লাগুলো খোঁড়লের ওপর সাজিয়ে রাখল, যাতে বোঝা না যায় ওখানে কেউ ছিল। মুখ বন্ধ করার আগে ভালমত দেখে নিল, ওরা যে এখানে ছিল সেটা বোঝার মত কোন জিনিস ফেলে যাচ্ছে কিনা।

'আকাশের অবস্থাটা ভাল ঠেকছে না আমার,' সেদিকে তাকিয়ে থেকে বলল কিশোর।

'কেন?'

'পরিবর্তনটা টের পাচ্ছ না? সাগরের দিক থেকে আসা মেঘের রঙ দেখেছ?'

'বৃষ্টি নামলে তো ভালই হয়। ঠাণ্ডা কমবে।'

'হঠাৎ গরম পড়লে তুষার পড়তে শুরু করবে। ওই মেঘগুলো ভারী হয়ে গেছে। তুষার পড়া শুরু হলে ষোলোকলা পূর্ণ হবে আমাদের।'

'কেন?'

'মাথাটা খাটাও, রবিন। তুষারের মধ্যে হাঁটতে গেলে চিহ্ন ফেলে ফেলে যেতে হবে। প্রহরীদের চোখ এড়িয়ে চলাফেরা করব কি করে তখন?'

'তাই তো, এ কথা তো ভাবিনি!'

'তুষার পড়লে আঙ্কেলকে মুক্ত করার কাজেও বাধা আসবে। থাক, এখানে দাঁড়িয়ে এ সব আলোচনা করার দরকার নেই এখন। কে আবার কোনদিক দিয়ে চলে আসে।'

চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে রাখতে হেঁটে চলল ওরা। নদীর ওপরের ব্রিজটার কাছে পৌঁছতে অন্ধকার হয়ে গেল। বার্চের জটলার ভেতর দিয়ে এগোতে এগোতে থমকে দাঁড়াল কিশোর। রবিনের হাত চেপে ধরল। কানে কানে কথা বলে শব্দ করতে নিষেধ করল। হাত তুলে দেখাল ব্রিজের দিকে।

কারও কথা শোনা গেল না। তবে আগুন দেখতে পেল রবিন। ব্রিজের ওপারে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে কেউ। ধীরে ধীরে অস্পষ্ট ছায়ামূর্তিটাও চোখে পড়ল।

'সারা রাতের জন্যেই যদি ব্রিজ পাহারা দেয়, তাহলে ভাল বিপদে পড়েছি বলতে হবে,' ফিসফিস করে বলল কিশোর। 'এ রকম রাতে নদী সাঁতরে পেরোতে গেলে ঠাণ্ডায় জমে মরব। মিকোশা যেখান দিয়ে দৌড়ে পেরিয়েছে, সেখান দিয়ে যেতেও রাজি নই। মোট কথা পানিতে নামতেই রাজি না এখন। বসে বসে কি ঘটে দেখা ছাড়া উপায় নেই।'

একটু পরে বলল, 'লোক ওখানে দুজন। কথা শুনতে পাচ্ছ?'

'হ্যাঁ।'

অপেক্ষা করতে লাগল ওরা। বসে থাকা আরও কষ্টকর করে তুলল ভীষণ ঠাণ্ডা বাতাস।

ঘণ্টাখানেক পর কথা বলতে বলতে আরও দুজন লোক এসে হাজির হলো। ব্রিজের কাছের দুজনকে নিয়ে চলে গেল জেলখানার দিকে। অস্পষ্ট হতে হতে মিলিয়ে গেল ওদের কথার শব্দ।

কথা থেমে যাওয়ার পরেও আরও কয়েক মিনিট অপেক্ষা করল কিশোর। তারপর বলল, 'চলো, এ-ই সুযোগ। চট করে পেরিয়ে যাই। বলা যায় না, পাহারা দেয়ার জন্যে নতুন লোক পাঠাতে পারে। বনের মধ্যে টহল দিয়ে এসেছে এরা। রাতেও এখন নিরাপদ না এ জায়গা। যে কোন সময় নাইট-গার্ডের সামনে পড়ে যেতে পারি।'

নয়

ডিঙিতে করে কিশোর আর রবিনকে এগিয়ে নিতে এল মুসা। 'এত দেরি করে এলে। আমরা তো ভাবনায় পড়ে গিয়েছিলাম।'

'কেবিনে চলো। সব বলছি,' কিশোর বলল। 'ভাল কথা, আবহাওয়ার খবর কি? রেডিও শুনেছ নাকি?'

'শুরুতেই আবহাওয়ার খবর কেন?'

'কারণ আছে। আবহাওয়ার ওপর এখন অনেক কিছু নির্ভর করছে। রেডিও শুনেছ?'

'ওমর ভাই শুনেছে। সারাক্ষণ রেডিও নিয়েই পড়ে থেকেছে। অবস্থা নাকি ভাল না।'

চিন্তায় পড়ে গেল কিশোর। কেবিনে পা রেখে প্রথমে তাই জিজ্ঞেস করল, 'আবহাওয়া নাকি খুব খারাপ হতে যাচ্ছে?'

'কি করে জানলে?' ভুরু নাচাল ওমর।

'মুসার কাছে শুনলাম।'

'হ্যাঁ। আর কোন কাজ না পেয়ে বসে বসে রেডিওই শুনেছি,' জবাব দিল ওমর। 'জাপান রেডিওর খবরে বলল, উত্তর-পুব থেকে ধেয়ে আসছে ঝোড়ো হাওয়া, পুরো এলাকায় তুষারপাত হওয়ার সম্ভাবনা–আমাদের এই এলাকাটা সহ।'

'বড়ই দুঃসংবাদ,' নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরল কিশোর। গা থেকে জ্যাকেট খুলে রেখে চেয়ারে বসল। কফি আর স্যান্ডউইচ এনে দিল মুসা।

'উত্তর-পুব,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর। 'তুষারপাত না হলেও সাগর এত উত্তাল হয়ে উঠবে, বেরোনোই কঠিন হয়ে যাবে আমাদের জন্যে। যাকগে, যা হবার হবে। সব তো আর আমাদের ইচ্ছে মত ঘটবে না, অত ভেবে লাভ নেই।' মিকোশার দিকে তাকাল সে, 'আমাদের দিয়ে এসে কাল রাতে ঠিকমত ফিরেছিলেন তো আপনারা? কোন সমস্যা হয়নি?'

'না। দুজন গার্ডকে আসতে দেখলাম। চট করে লুকিয়ে পড়লাম গাছের আড়ালে। আমাদের সামনে দিয়ে কথা বলতে বলতে চলে গেল ওরা।'

ওমরের দিকে তাকাল কিশোর, 'এদিকে কিছু ঘটেছিল, ওমরভাই?'

'না। আমিও দুজন গার্ডকে দেখেছি। ভাটির দিকে চলে গেল কথা বলতে বলতে। তবে বেশি দূর যায়নি। বিশ মিনিটের মধ্যেই ফিরে এসে চলে গেল যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে।'

'মারকভকে দেখেছেন?'

'না।'

'নদীতে নৌকাটৌকা কিছু?'

'দুটো মাছধরা নৌকা বেরিয়েছিল, কিন্তু বাতাস শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফিরে গেছে,' ওমর বলল। 'তা তোমাদের কেমন কাটল? কথা হয়েছে মিস্টার মিলফোর্ডের সঙ্গে? জানার জন্যে অস্থির হয়ে আছি।'

'আমরা সফল,' জবাব দিল কিশোর। 'যে ভাবে যা আশা করেছিলাম, ঠিক সেইমতই ঘটেছে।' কয়লা পাহাড়ে কি কি ঘটেছে খুলে বলল সে। 'সব জেনে এসেছি। এখন আবহাওয়া বেশি খারাপ হয়ে যাওয়ার আগেই কাজটা সেরে ফেলতে হবে।'

'বেশ,' মুসা বলল, 'কি করে সারবে বলে ফেলো।'

'কাল সকালেই আঙ্কেলকে বের করে নিয়ে আসার চেষ্টা করব। আমার একটা পরিকল্পনা আছে। কাজেই মন দিয়ে শোনো।' ওমর আর মিকোশার দিকে তাকাল, 'আপনারাও শুনুন। সব কিছু নির্ভর করছে আবহাওয়ার ওপর। সেটা নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা আমাদের নেই। আমার পরিকল্পনায় টাইমিং একটা মস্ত ব্যাপার। এর নিয়ন্ত্রণ অবশ্য আমাদের হাতে রয়েছে। যদি কিছু গড়বড় হয়, আমাদের দোষেই হবে।'

'লেকচার থামিয়ে দয়া করে আসল কথাটা বলে ফেলো না ছাই,' অধৈর্য হয়ে উঠল মুসা।

'হ্যাঁ, শোনো, কাল ভোরবেলা আলো ফোটার আগেই আবার গিয়ে কয়লার স্তূপে খোঁড়লের মধ্যে বসব। আজকের মতই রবিন থাকবে আমার সঙ্গে। আঙ্কেলকে যদি অন্য কোনখানে কাজ করতে পাঠায় তাহলে বিরাট সমস্যায় পড়ে যাব। তবে আমার মনে হয় না অন্য কোথাও পাঠাবে। যেখানে দিয়েছে ওখানকার কাজ শেষ হয়নি। যাই হোক, সরিয়ে দিলে নতুন চিন্তা করতে হবে। মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে এখন। তাড়াহুড়ো করে ঝুঁকি নেয়া চলবে না। একবার যদি ওরা বুঝে ফেলে, তাঁকে মুক্ত করার চেষ্টা চলছে, হয়তো এমন জায়গায় সরিয়ে ফেলবে, কাছেও ঘেঁষতে পারব না আর; হয়তো অন্য কোন জেলেই পাঠিয়ে দেবে। যদি ওরকম কিছু না ঘটে, তাহলে দৌড় দিতে বলার আগে তাঁর শিকলটা খোলার ব্যবস্থা করব আমরা।'

'গার্ডদের সামনে কি করে খুলবে?' কৌতূহলী হয়ে উঠেছে মিকোশা। কিশোরের কথাবার্তার ধরন অবাক করছে তাকে। বড়দের মত ভাবভঙ্গি, বয়েসের সঙ্গে বেমানান, খাপছাড়া; তবে মনে মনে স্বীকার তাকে করতেই হলো, বুদ্ধি আছে ছেলেটার মাথায়।

'না খুললে দৌড়াতে পারবেন না তিনি।'

'এই অসম্ভবটা কি করে সম্ভব করবে শুনি?'

'অসম্ভবকে সম্ভব করা যায় না। তবে যদি চুপ করে শোনেন, বুঝতে পারবেন কাজটা কঠিন হলেও অসম্ভব নয়।'

'ঠিক আছে, বলে যাও, শুনি।'

'সঙ্গে করে একটা লোহাকাটা করাত নিয়ে যাব আমি। আমার টুলকিটে অনেক প্রয়োজনীয় জিনিস আছে, গোয়েন্দাগিরি করি তো, তা ছাড়া একটা বিশেষ কাজে এসেছি, তৈরি হয়েই এসেছি। জেলখানার শিক কাটতে হতে পারে ভেবে লোহাকাটা করাতও এনেছি। ওটা দিয়ে সিকি ইঞ্চি মোটা লোহার শিকল কাটতে মোটেও বেগ পেতে হবে না।'

'কিন্তু গার্ডদের চোখে পড়ার সমস্যার কি করবে?'

'কাজটা ঘটতে দেখবে না ওরা।'

'ওরা অন্ধ নয়। কি করে ভাবলে বসে বসে করাত দিয়ে শিকল কাটবেন মিস্টার মিলফোর্ড, আর গার্ডরা দেখতে পাবে না?'

'কারণ তিনি খোঁড়লের মধ্যে রবিনের সঙ্গে বসে শিকলটা কাটবেন।'

'তিনি যে উধাও হয়ে গেছেন, সেটা ঠিকই লক্ষ করবে গার্ডেরা।'

'না, করবে না। কারণ, জেলখানার কুৎসিত পোশাক পরে তখন তাঁর জায়গা

দখল করব আমি। পোশাকটা পরে থাকতে নিশ্চয় ভাল লাগছে না আপনার।
আমাকে দিয়ে দেবেন। আমি এটা পরে খোঁড়লে বসে থাকব। খোঁড়লের মুখের
সামনে একটু দূরে কয়লার স্তূপ আছে। ওটার জন্যে দূর থেকে মুখটা প্রহরীর চোখে
পড়ে না। চট করে সামনের কয়লাগুলো সরিয়ে বেরিয়ে পড়ব আমি। আঙ্কেল ঢুকে
পড়বেন। মুখটা তাড়াতাড়ি আবার বন্ধ করে দেবে রবিন। ভেতরে বসে শিকল
কাটবেন আঙ্কেল।' মিকোশার মুখের দিকে তাকাল কিশোর। 'প্রহরী কি আর
দেখতে পাবে তখন?'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত কথা বলল না মিকোশা। তারপর মাথা ঝাঁকাল ধীরে ধীরে,
'নাহ্, স্বীকার করতেই হচ্ছে তোমার প্ল্যানটা সত্যি চমৎকার।'

গুঞ্জন উঠল সবার মধ্যে।

'আঙ্কেল যখন শিকল কাটতে থাকবেন,' কিশোর বলল, 'আমি তখন তাঁর কাজ
চালিয়ে যাব। শিকল কাটতে দশ মিনিটের বেশি লাগবে না তাঁর।' সবার মুখের
ওপর চোখ বোলাল একবার সে। 'এবার আসা যাক টাইমিং, অর্থাৎ সময়ের
ব্যাপারে। আমি ঠিক ন'টায় বেরিয়ে যাব খোঁড়ল থেকে। আঙ্কেলের কাটতে লাগবে
দশ মিনিট। কাজ শেষ হয়ে যাবে ন'টা দশে। পাঁচ মিনিট হাতে রাখলাম। তাতে হয়
ন'টা পনেরো। এই সময় কাজ শুরু করবে ওমর ভাই আর মুসা। তাদেরটা ফেল
করলে সব বরবাদ।' রবিনের দিকে তাকাল সে, 'দেখি, আমাকে একটা পেন্সিল আর
একটা কাগজ দাও তো।'

বের করে দিল রবিন।

এঁকে দেখাল কিশোর, 'এই যে, এটা হলো কয়লা পাহাড়। এটা আমাদের
খোঁড়ল। আর এখান থেকে কয়লা তুলে ঠেলায় ভরেন আঙ্কেল। এখান থেকে
চল্লিশ-পঞ্চাশ গজ দূরে এই যে এখানটায় বনের সীমানা। বেশির ভাগ ফার গাছ।
এটা হবে আমাদের প্রথম লক্ষ্য। যদি কোনমতে ঢুকে পড়তে পারি, লুকিয়ে পড়ার
প্রচুর জায়গা পাব। যাকগে, সেটা পরের কথা। এই যে এখানটায় আরেকটা পাহাড়,
কয়লা পাহাড় আর জেলখানার মাঝখানে। অত বেশি উঁচু না, আবার কমও
না—পাহাড়টার জন্যে জেলখানা থেকে কয়েদীদের কাজ দেখা যায় না। খাটো খাটো
রডোডেনড্রন ঝোপ, ছেটে ফেলা শুকনো ডালপাতায় ভর্তি পাহাড়ের ওপরটা। আগুন
দিলে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে। বাতাস পেলে দ্রুত ছড়িয়ে পড়বে।'

'আর তাতে ধোঁয়াও হবে প্রচুর,' ওমর বলল।

'ঠিক। স্মোক স্ক্রীন তৈরির কথা বলছি আমি, ধোঁয়ার পর্দা। আপনি আর মুসা
গিয়ে পাহাড়ের ওপরে কোন ফাটল-টাটলে ঘাপটি মেরে পড়ে থাকবেন, আমি আর
রবিন যখন খোঁড়লে থাকব। আগুনটা সহজে ধরানো এবং ছড়ানোর জন্যে পেট্রল
ব্যবহার করতে পারেন আপনারা। প্লেনের ট্যাংক থেকে বের করে বোতলে করে
নিয়ে যেতে পারেন। ঠিক ন'টা পনেরো মিনিটে আগুন লাগাবেন। আগুন আর
ধোঁয়ার দিকে নজর সরে যাবে প্রহরীদের, কয়েদীদের দিকে মনোযোগ থাকবে না।
এই গণ্ডগোলের মধ্যে ধোঁয়ার চাদরের আড়াল নিয়ে বনের দিকে দৌড় দেব
আমরা—প্রহরীরা আমাদের দেখুক বা না দেখুক।'

'কিন্তু কিশোর, একটা কথা ভেবে দেখা উচিত,' রবিন বলল, 'আগুনের ফাঁদে

পড়ে যেতে পারে শিকল পরা কয়েদীরা। শিকল পরে কেউই ঠিকমত দৌড়াতে
পারবে না। আগুন ওদের ধরে ফেলবে। একজনকে বাঁচানোর জন্যে—হোক না সেটা
আমার বাবা, এতগুলো মানুষকে মারাত্মক বিপদের মধ্যে ফেলে দিতে পারি না
আমরা।'

'সেদিকটাও ভেবেছি আমি। আগুন ওদের কাছে পৌঁছবে না, কাজেই কোন
ঝুঁকিও নেই।'

'বেশ,' ওমর বলল, 'দাবানল তো লাগালাম। তারপর?'

'ব্রিজের দিকে ছুটবেন। ব্রিজ পেরিয়ে এই ল্যাগুনটার পাড়ে চলে আসবেন যত
তাড়াতাড়ি সম্ভব। ধোঁয়ার জন্যে আপনাদের দেখতে পাবে না গার্ডরা। গুলি করতে
পারবে না। জেলখানা থেকে দেখা যাওয়ার একটা সম্ভাবনা অবশ্য আছে। কিন্তু
আপনারা যেখানে থাকছেন সেখান থেকে জেলখানাটা অনেক দূরে। অতদূর থেকে
গুলি করে লাগাতে পারবে না। কেউ যদি তাড়া করে আসে, তার আগেই ব্রিজের
কাছে পৌঁছে যাবেন আপনারা। ব্রিজ পেরিয়ে বনে। ভাল আড়াল পেয়ে যাবেন।
আপনাদের ধরা আর তখন অত সহজ হবে না। একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন,
এদিকে যে আসছেন, এটা যেন কোনমতেই বুঝতে না পারে ওরা।'

'যদি সামনে থেকে কিংবা পাশ থেকে এসে পথরোধ করে?'

'সেটা সামলানোর ভার আপনাদের। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা। পিস্তল তো সঙ্গে
থাকছেই। প্রয়োজনে গুলি করে হলেও বাধা দূর করে নেবেন।'

'তা বটে,' বিড়বিড় করল মুসা। 'জান বাঁচানো ফরজ।'

'মিকোশা,' কিশোর বলল, 'প্লেনের দায়িত্ব থাকবে আপনার ওপর। প্লেনের
ভেতর থাকতে পারেন, কিনারে খালের পাড়ে থাকতে পারেন, আপনার ইচ্ছে। রেডি
থাকবেন, যাতে আমরা এলে যত দ্রুত সম্ভব আমাদের নিয়ে উড়াল দিতে পারেন।
সব প্ল্যান মাফিক হয়ে যাওয়ার পরও দ্বীপ থেকে পালাতে না পারলে কোন লাভ হবে
না। ভয় আরও আছে। কয়েদী পালিয়েছে যেই বুঝতে পারবে ওরা, রেডিও আর
টেলিফোনে যোগাযোগের হিড়িক পড়ে যাবে। কাছাকাছি ওদের কোন বিমান-বন্দর
থেকে প্লেন উড়ে আসতে পারে আমাদের বাধা দেয়ার জন্যে।'

'তোমার প্ল্যানে ছোট্ট একটা খুঁত আছে,' মিকোশা বলল।

তার দিকে তাকাল কিশোর, 'কি?'

'চেহারা। দাড়িগোঁফে ভরা মিস্টার মিলফোর্ডের মুখ, লম্বা লম্বা চুল। তোমার
কই? বহুদূর থেকে চিনে ফেলবে গার্ড যে তুমি অন্য লোক।'

মুচকি হাসল কিশোর, 'আপনি ভেবেছেন এতবড় একটা খুঁতের কথা মাথায়
ছিল না আমার? সেটা আগেই ভেবে রেখেছি। ছদ্মবেশের সমস্ত জিনিসপত্র রয়েছে
আমার টুলকিটে। আপনার অবগতির জন্যে আরও একটা কথা জানিয়ে রাখি,
ছোটবেলা থেকেই ছদ্মবেশ নেয়া আমার কাছে বেশ মজার একটা খেলা। বহু
প্র্যাকটিস করেছি। কাজেই গার্ডদের ফাঁকি দেয়াটা মোটেও কঠিন হবে না আমার
জন্যে।'

কিশোরের দিকে তাকিয়ে রইল মিকোশা। ধীরে ধীরে হাসি ছড়িয়ে পড়ল
মুখে। 'নাহ্, কোনভাবেই ভুল বের করতে পারলাম না তোমার। তারমানে তোমার

প্ল্যান সফল হতে বাধ্য।'

'কেন, এখনও সন্দেহ আছে নাকি আপনার?' কিশোরও হাসল। 'আর কোন খুঁত মাথায় এসে থাকলে বলুন। ভুল আছে কিনা জানার জন্যেই তো সবার সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনা করছি। সামান্য একটা ভুলেও সবাই মারা পড়তে পারি আমরা।'

মাথা নাড়ল মিকোশা, 'না, আমি তো কোন ভুল দেখতে পাচ্ছি না।'

'বেশ, তাহলে আলোচনা এখানেই শেষ।' ঘড়ি দেখল কিশোর। 'সময় আছে। ঘণ্টা তিনেক ঘুমিয়ে নেয়া যায়। অবশ্য এত উত্তেজনার মাঝে যদি ঘুম কারও আসে।...তো, মিস্টার মিকোশা, আমার কাপড়ের সঙ্গে আপনার জেলখানার পোশাক বদল করতে কোন আপত্তি নেই তো?' হাসল সে। 'ওগুলোর ওপর বেশি মায়া থাকলে পরে ফেরত দিয়ে দেব নাহয়।'

'ইয়ার্কি মারছ!' হাসল মিকোশা। 'ফেরত তো দেয়া লাগবেই না, এই গন্ধের হাত থেকে বাঁচানোর জন্যে কোন দিন যদি সুযোগ আসে বরং পুরস্কার দেব তোমাকে।'

'তাহলে খুলুন। আমার কাপড়গুলো গায়ে লাগবে তো আপনার?'

'লাগবে। জেলখানার পোশাক নিয়ে তোমার কোন ভাবনা নেই। এগুলোর কোন মাপ থাকে না। কারও টাইট হয়, কারও ঢিলা—এ নিয়ে মাথা ঘামানোর অবস্থা নেই কয়েদীদের।'

ওমর বলল, 'তোমরা বদলাবদলি করতে থাকো, আমি চট করে গিয়ে আকাশের অবস্থাটা দেখে আসি।'

মিনিট্‌খানেকের মধ্যেই ফিরে এল সে। জানাল, 'শুকনো। বাতাসের মোড় ঘুরেছে সামান্য, সোজা মোহনার দিকে বইছে এখন। সাগর উত্তাল। তবে এখনও দুশ্চিন্তার কিছু নেই। বাতাসের গতি এখন যেদিকে আছে, সেদিকে থাকলে আগুন ছড়াতে সুবিধে হবে।' কিশোরের দিকে তাকাল, 'ক'টায় রওনা হতে চাও?'

'ভোর চারটায়। আগেভাগেই গিয়ে গুছিয়ে বসতে চাই। দেরিতে গিয়ে তাড়াহুড়া শুরু করলে ভুল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা।'

দশ

ঠিক চারটায়, যখন রওনা হলো ওরা, অন্ধকার তখনও জমাট বেঁধে আছে। পকেট ভর্তি সরঞ্জাম নিয়েছে, ভারী হয়ে আছে পকেট। ডিঙিতে করে ওদের নামিয়ে দিল মিকোশা।

ওদের পরিকল্পনায় ছোট একটা পরিবর্তন জানা হয়েছে। ওমর আর মুসা আগুন লাগানোর পর দৌড়ে এসে ব্রিজ পার হয়ে সোজা ট্রেনের কাছে যাবে না। ব্রিজের অন্যপারে লুকিয়ে বসে কিশোরদের আসার অপেক্ষায় থাকবে। তারপর সবাই মিলে একসঙ্গে আসবে ল্যাগুনের পারে। দুটো সুবিধে হবে এতে। পথে কোন বাধা এলে প্রতিরোধ করার শক্তি বেশি পাবে; আর দ্বিতীয়ত এক দলের জন্যে আরেক দলকে

অহেতুক দুশ্চিন্তা আর উদ্বেগের মধ্যে থাকতে হবে না।

গত কয়েক ঘণ্টায় আবহাওয়ার আর পরিবর্তন ঘটেনি। বাতাস এখনও শুকনো। আসি আসি করতে থাকা তুষার এখনও এসে হাজির হয়নি, যদিও আকাশ ভারী মেঘে ঢাকা; চাঁদ-তারার মুখ দেখা যাচ্ছে না। মাঝারি গতিতে বয়ে চলেছে হাড় কাঁপানো ভয়ানক ঠাণ্ডা বাতাস। পানিতে ঢেউয়ের নাচন। তবে পানি ফুলে-ফেঁপে খালে ঢুকে প্লেনটার ক্ষতি করার মত অবস্থা এখনও হয়নি।

খুব সাবধানে, নিঃশব্দে এগিয়ে চলেছে দলটা। তাড়াতাড়ি চলতে পারছে না। পারার কথাও নয়। অন্ধকার বনের মধ্যে শব্দ না করে সাবধানে চলতে গেলে গতি কমে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। তবে ভাবনা নেই। আগেভাগে বেরিয়ে পড়েছে। ভোর হওয়ার আগেই তৈরি হয়ে বসে যেতে পারবে যার যার জায়গায়।

নিরাপদেই ব্রিজের কাছে পৌঁছে গেল ওরা। পিস্তল হাতে ব্রিজের আশেপাশে একবার চক্কর দিয়ে এল ওমর। কোথাও কোন বিপদ ওত পেতে আছে কিনা নিশ্চিত হয়ে নিল।

কিছু ঘটল না।

ব্রিজের গোড়ায় পৌঁছে পুরো একটা মিনিট ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে কান পেতে রইল সে। আলো ফুটেছে কিছুটা। কয়েক গজ দূর পর্যন্ত দৃষ্টি চলে এখন। কিছুই চোখে পড়ল না ওর, কিছু শুনলও না। মৃদু শিস দিল সে। ঝুঁকি নিল। কাছাকাছি কেউ থেকে থাকলে তার শিসের সাড়া দেবে। কিন্তু জবাব এল না।

সবার আগে ব্রিজ পেরোল সে। এক এক করে তাকে অনুসরণ করল সবাই। অন্য পাশে ব্রিজ থেকে বেশ খানিকটা দূরে গিয়ে দাঁড়াল।

'যাক, ভালোয় ভালোয় চলে এলাম। কোন অঘটন যে ঘটেনি,' ওমর বলল, 'খুশি লাগছে আমার। ব্রিজ পেরোনোর সময় ভয়ে কাঁটা হয়ে গিয়েছিলাম আমি। কেউ পাহারা থাকলে ওখানেই থাকার কথা ছিল।'

'হ্যাঁ।' হাত তুলে দেখাল কিশোর, 'ওই যে আপনাদের পাহাড়—আপনার আর মুসার। গিয়ে পজিশন নিন। মুসা, মাথা নামিয়ে রাখবে। কোন শব্দ করবে না। কি ঘটছে দেখার চেষ্টা করবে না। তুমি শত্রুদের দেখার চেষ্টা করলে শত্রুরাও তোমাকে দেখে ফেলবে। এ ধরনের কাজে বেশি কৌতূহল গণ্ডগোল বাধায়।' মুসার পকেটের দিকে তাকিয়ে ভুরু কুঁচকাল সে। 'পকেটে কি? উঁচু হয়ে আছে?'

'এই দু'চারটা টুকিটাকি জিনিস। মনে হলো যদি কাজে লেগে যায়।'

সন্দেহের চোখে তার দিকে তাকাল কিশোর। 'দেখো, বোকামি করে বোসো না।'

'করব না, নিশ্চিন্ত থাকতে পারো। বোকামি করলে যে মরতে হবে সে-ভয় কি নেই আমার ভেবেছ।'

'ঠিক আছে, ওমর ভাই,' কিশোর বলল, 'যান আপনারা।'

ঘুরে দাঁড়াল ওমর আর মুসা। লম্বা লম্বা পা ফেলে দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেল।

'এসো, রবিন,' কিশোর বলল, 'আমরাও যাই। সময়মতই এসেছি। এই ভয়ানক আবহাওয়ায় এত সকালে আমার মনে হয় না কেউ আছে।'

কিন্তু নেই বলে সাবধানতার যে কমতি হলো, তা নয়। ধূসর হয়ে আসছে

আকাশের রঙ। আরেকটা দিনের আগমন। যত তাড়াতাড়ি পারল খোঁড়লে ঢুকে বন্ধ করে দিল মুখটা।

ধীরে ধীরে আরও পরিষ্কার হলো আকাশ। সীসার মত রঙ এখন। পায়ে শিকল পরানো কয়েদী আর তাদের সশস্ত্র প্রহরীদের আসার ঝমঝম শব্দ পাওয়া গেল। পাহাড়ের বাঁক ঘুরে বেরিয়ে এল। কয়লা পাহাড়ে যার যার জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল।

পরম স্বস্তির সঙ্গে কিশোর দেখল, আগের দিনের জায়গাতেই কাজ করতে এসেছেন মিস্টার মিলফোর্ড। তবে একটা পরিবর্তন করা হয়েছে। আজ তাঁর সঙ্গে কাজ করতে এসেছে আরেকজন। তারমানে আজকের মধ্যেই যত কয়লা আছে এখানে, সব সরিয়ে ফেলতে বলা হয়েছে–সেজন্যেই দুজন দিয়েছে। দ্বিতীয় লোকটার কাজ হলো, ঠেলাগাড়ি ভরতে সাহায্য করা, আর মিস্টার মিলফোর্ডের কাজ সেগুলো জায়গামত রেখে আসা।

দ্বিতীয় লোকটা ভাবনায় ফেলে দিল কিশোরকে। এর চোখকে ফাঁকি দিয়ে কিছু করা কঠিন হয়ে যাবে। বেঈমানী করবে বলে মনে হয় না, তবে তার চমকে যাওয়ার ভঙ্গি প্রহরীদের নজরে পড়ে যেতে পারে। আসলে যে কি ঘটবে আগে থেকে বলা যায় না। অঘটন ঘটলেও তার কিছু করার নেই আর এখন। আপাতত প্রহরীদের দিকে নজর দিল সে।

প্রহরীর সংখ্যা আগের দিনের মতই আছে। আগের দিন যে যেখানে পাহারায় ছিল, আজও সেখানেই পাহারা দিচ্ছে।

দিনের কাজ শুরু হলো। ঘড়ি দেখল কিশোর। আটটা বেজে কয়েক মিনিট হয়েছে। ঠেলাগাড়ির প্রথম কিস্তিটা বোঝাই করে এগিয়ে এলেন মিস্টার মিলফোর্ড। কিশোরের মনে হলো আগের দিনের চেয়ে মিস্টার মিলফোর্ড আজ যেন একটু বেশি সতর্ক।

খোঁড়লের সামনে দিয়ে তিনি যাবার সময় নিচু স্বরে রবিন বলল, 'আমরা এসে গেছি, বাবা। সব ঠিকঠাক মত চলছে। এখন থেকে এক ঘণ্টার মধ্যে পালাব আমরা। কিশোর আমার সঙ্গে আছে। কয়লাগুলো রেখে এসো, আরও কথা আছে।'

মাল নামাতে দশ মিনিট লাগল মিস্টার মিলফোর্ডের। ফিরে আসতে আরও পাঁচ। খালি ঠেলা, যাচ্ছেন নিচের দিকে, আসার চেয়ে যেতে এই সময় লাগল কম। কাজেই কথা বলার সময়ও পাওয়া গেল কম। কিশোর বলল, 'যদি কোন গণ্ডগোল বাধে, কিংবা কোন কারণে কাজ বন্ধ করে দিতে চায় প্রহরীরা, সোজা এখানে চলে আসবেন। আমাদের কাছে পিস্তল আছে।'

জবাব দিলেন না মিস্টার মিলফোর্ড।

পরের বার আবার গাড়িভর্তি কয়লা নিয়ে যখন খোঁড়লের কাছ দিয়ে যাচ্ছেন, কিশোর বলল, 'আমি আপনাকে সঙ্কেত দেয়ামাত্র এখানে চলে আসবেন। আমি বেরিয়ে যাব, আপনি ঢুকে পড়বেন। রবিনের কাছে করাত আছে, শিকল কেটে দেবে।'

এবারও জবাব দিলেন না মিস্টার মিলফোর্ড।

কিশোর বলল, 'চল্লিশ মিনিটের মধ্যে পেছনের পাহাড়টায় আগুন ধরিয়ে দেয়া হবে। ধোঁয়া দেখা গেলে গার্ডেরা যে আদেশই দিক না কেন, সব কিছু উপেক্ষা করে

আপনি সোজা চলে আসবেন এখানে।'

কথা বললেন না মিস্টার মিলফোর্ড। চলে গেলেন গাড়ি ঠেলে নিয়ে। সন্দেহ হলো কিশোরের। জবাব দিচ্ছেন না কেন? শুনতে পাচ্ছেন না নাকি? না দ্বিতীয় লোকটার জন্যে এ রকম না শোনার ভান করে রয়েছেন?

পরের বার যাওয়ার সময় জিজ্ঞেস না করে পারল না কিশোর, 'আপনি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন না?'

খুব সামান্য মাথা ঝাঁকালেন মিস্টার মিলফোর্ড।

আর কোন কথা হলো না। এবার শুধু অপেক্ষার পালা।

মিনিট গুনতে আরম্ভ করল কিশোর। আরও বিশ মিনিট বাকি। তীব্র উত্তেজনায় রবিনের ঠোঁট কাঁপছে।

কিশোর বলল, 'শান্ত থাকো।'

কিন্তু সে নিজেই শান্ত থাকতে পারছে না। উত্তেজনাটা তার মাঝেও সংক্রমিত হয়েছে। অঘটন ঘটে যাওয়ার প্রচুর সময় আছে এখনও।

ন'টা বাজতে দশ মিনিটের সময় হালকা তুষারের একটা কণা বাতাসে ভেসে আসতে দেখল সে। মাত্র একটা কণা। কিন্তু তার চোয়ালটাকে কঠিন করে তোলার জন্যে যথেষ্ট। সে জানে, এরপর আরও আসবে। এক্ষণে আর যাই হোক, তুষারপাত চায় না সে। তুষার পড়ে ভিজে গেলে কোন কিছুতেই আর আগুন ধরবে না ঠিকমত। তা ছাড়া তুষারপাতের সুযোগে পালানোর চেষ্টা করতে পারে কয়েদীরা–এই ভয়ে তাদের ডেকে নিয়ে যাবে প্রহরীরা।

তুষার পড়া বাড়তে শুরু করল। ঘূর্ণিবাতাসে পাক খেতে শুরু করেছে কণাগুলো। দৃষ্টিশক্তিতে বাধা সৃষ্টির মত ঘন হয়নি এখনও। তবে এটা নিশ্চিত, ঝড় আসছে। অদ্ভুত রঙ হয়েছে আকাশের। রঙটা যে ঠিক কি, বলতে পারবে না কিশোর।

ন'টা বাজতে পাঁচ। আর দেরি না করে কাজ শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল সে। এ ভাবে প্ল্যান পরিবর্তন করলে মুসা আর ওমরের জন্যে ঝুঁকির ব্যাপার হয়ে যাবে। কিন্তু অপেক্ষা করলে বিফল হয়ে ফেরত যাওয়া লাগতে পারে। তুষারঝড়ের মধ্যে নিশ্চয় কয়েদীদের খোলা জায়গায় কাজ করতে দিতে চাইবে না প্রহরীরা। কারণ তাদের নিজেদের তুলনায় কয়েদীর সংখ্যা অনেক বেশি।

রবিনকে বলল সে, 'পরের বার তোমার বাবা এলেই বেরিয়ে যাব আমি।'

মিস্টার মিলফোর্ড তখন ঠেলা বোঝাই করছেন। ভরে গেছে, আর দুই তিন মিনিটের মধ্যেই নিয়ে চলে আসবেন। কিন্তু এই সময় ঘটল অঘটন। বেশি বোঝাই হয়ে গিয়েছিল বোধহয়, উল্টে গেল ঠেলাটা। হাতল চেপে ধরে রেখেও কিছু করতে পারলেন না। সমস্ত কয়লা ছড়িয়ে পড়ল পাহাড়ের ঢালে। দুর্ঘটনা ঘটার যেন আর সময় পেল না।

কিশোর আশা করল, গার্ডের চোখে পড়বে না। কিন্তু ঠিকই পড়ল। চিৎকার করে বলে উঠল কি যেন। কথা বুঝতে পারল না কিশোর। ভাবল, আরও সাবধান হয়ে কাজ করতে বলছে। ব্যাপারটা এখানেই শেষ হয়ে গেলে কোন ক্ষতি হত না। কিন্তু কর্তৃত্ব জাহির করার জন্যে গটমট করে এসে হাজির হলো লোকটা। ভাষা না

বুঝলেও তার ভঙ্গিতেই বোঝা যায় গালাগাল করছে। পেছন থেকে এসে শপাং করে মিস্টার মিলফোর্ডের পিঠে বাড়ি মারল। ঝুঁকে কাজ করছিলেন তিনি। বাড়িটা যে আসছে দেখতে পাননি। বাড়ি খেয়ে পড়েই যাচ্ছিলেন। তবু একটা শব্দ বেরোল না তাঁর মুখ থেকে। কাজ করে গেলেন এমন ভঙ্গিতে যেন কিছুই ঘটেনি। এটা সহ্য করতে পারল না প্রহরী। প্রচণ্ড রাগে আবার বাড়ি মারল। এবার বাড়িটা আসতে দেখেছেন মিস্টার মিলফোর্ড। ঝট করে হাত তুলে নিলেন মুখের কাছে। বাড়িটা হাতে লাগল। এবারও কোন আওয়াজ বেরোল না মুখ থেকে।

প্রচণ্ড রাগে কাঁপতে শুরু করল রবিন। বেরোনোর জন্যে নড়ে উঠতেই ধরে ফেলল কিশোর, 'বোকামি কোরো না!' হিসিয়ে উঠল কানের কাছে। 'মরতে চাও নাকি?'

পেছনে হেলান দিয়ে এলিয়ে পড়ল রবিন। দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'ওকে···ওকে আমি ছাড়ব না!'

'সময় আসুক।'

গাড়িতে কয়লা ভরতে লাগলেন মিস্টার মিলফোর্ড। কয়লা ভরা শেষ করে রওনা হলেন রেখে আসার জন্যে। ঘাড়ের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল এতক্ষণ লোকটা। ধীরে ধীরে সরে গেল। আগের জায়গায় গেল না, তারচেয়ে আরেকটু কাছে অন্যখানে গিয়ে দাঁড়াল।

'আমি যাচ্ছি,' কিশোর বলল, 'এখন না গেলে আর সুযোগ পাব না।'

এগিয়ে আসছেন মিস্টার মিলফোর্ড। ভারী গাড়ি, ঠেলে আনতে কষ্ট হচ্ছে। দুই গজ দূরে থাকতে বলে উঠল কিশোর, 'যাচ্ছি।' হাতের ধাক্কায় ফোকরের মুখের কয়লা সরিয়ে বেরিয়ে গেল সে। মুখের কাছে চলে এসেছেন মিস্টার মিলফোর্ড। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির হাতল ছেড়ে দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে পড়লেন ফোকরের মধ্যে। হাতল ধরে গাড়ি ঠেলে নিয়ে চলল কিশোর। পুরো ব্যাপারটা ঘটাতে তিন-চার সেকেন্ডের বেশি লাগল না। চট করে পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখে নিল সে দ্বিতীয় লোকটা কি করছে। পাহাড়ের ঢালে আগের মতই কাজ করছে সে। কিছু দেখতে পায়নি।

মিস্টার মিলফোর্ড যে ভাবে গাড়ি ঠেলে নিয়ে গিয়ে কয়লা রেখে এসেছেন, সে-ও সেভাবেই রাখতে শুরু করল। চোখের কোণ দিয়ে নজর রেখেছে প্রহরীটার ওপর। লোকটাও তাকিয়ে আছে তার দিকে, তবে নড়ছে না। মিস্টার মিলফোর্ডের সঙ্গে বদলাবদলিটা সে দেখতে পায়নি; পেলে নরক গুলজার করে ফেলত এতক্ষণে।

আবার কয়লা আনার জন্যে ঢিবির কাছে ফিরে গেল কিশোর। আশা করছে দশ মিনিটেই কাটা হয়ে যাবে শিকল। তবে অঘটন ঘটার জন্যে দশ মিনিট প্রচুর সময়। কোনদিক দিয়ে যে কি ঘটে যাবে, বলা কঠিন।

খোঁড়লের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় করাত ঘষার শব্দ কানে এল কিশোরের। যতটা শব্দ হবে ভেবেছিল, তারচেয়ে বেশি হচ্ছে। তবে আশেপাশে অন্যান্য শব্দ এত বেশি, কানে গেলেও আলাদা করে চিনতে পারবে না প্রহরী। এর জন্যে বাতাসকেও ধন্যবাদ জানানো উচিত।

তুষারপাত বেড়েছে। একটানা ঝরতে শুরু করেছে সীসা রঙের আকাশ

থেকে। মনে মনে খোদাকে ডাকল কিশোর—খোদা, এর চেয়ে বেশি যেন আর না বাড়ে! মাত্র পাঁচটা মিনিট সময় দিলেই চলবে!

গাড়িতে কয়লা ভরতে শুরু করল আবার। হঠাৎ লক্ষ করল, তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে দ্বিতীয় লোকটা। তার মুখের দিকে নয়, পায়ের দিকে। কেন রয়েছে, সেটা তো বোঝাই যাচ্ছে। শেকল দেখতে পাচ্ছে না পায়ে। ভোঁতা চেহারার মাঝবয়েসী একজন মানুষ। গাইতিতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে কিশোরের পায়ের দিকে তাকিয়ে হয়তো ভেবে অবাক হচ্ছে, শিকলটা খুলল কি করে কয়েদীটা! ওর এই কাজ বন্ধ করে দেয়া নজর এড়াল না প্রহরীর। চিৎকার করে উঠল। চমকে গিয়ে আবার সচল হয়ে উঠল লোকটা।

আরেক মিনিট কাটল।

কাজ করতে করতে কিশোরের কাছে এগিয়ে এল দ্বিতীয় লোকটা। বিড়বিড় করে কিছু বলল। ভাষাটা জানে না কিশোর, বুঝতে পারল না কিছু। অনুমান করল, লোকটা জানতে চাইছে সে শিকল কাটল কিভাবে। ঘোঁৎ করে একটা শব্দ করল কেবল কিশোর। যা খুশি ধরে নিক লোকটা।

মিস্টার মিলফোর্ড খোঁড়লে ঢুকেছেন দশ মিনিট হয়ে গেছে। এতক্ষণে নিশ্চয় কাটা হয়ে গেছে শিকল, কিংবা কাটা শেষ হবার পথে। ওমরকে যা সময় দিয়ে এসেছিল কিশোর, তারচেয়ে পাঁচ মিনিট আগে বেরিয়েছে সে। কাজেই কাটার জন্যে পাঁচ মিনিট বেশি সময় পাবেন মিস্টার মিলফোর্ড। ওই সময়টা কাজ করে কাটাতে হবে কিশোরকে, কারণ কাঁটায় কাঁটায় সময় না হলে আগুন জ্বালবে না ওমর।

ঠেলা বোঝাই করে আবার সাজিয়ে রাখার জন্যে ফিরে যাচ্ছে কিশোর, এই সময় শুনতে পেল সেই জঘন্য শব্দটা, যেটার ভয় করছিল মনে মনে—বেজে উঠল প্রহরীর বাঁশি। প্রহরীদের সর্দার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে, এই পরিস্থিতিতে কয়েদীদের আর ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা নিরাপদ নয়। প্রতি মিনিটে তুষারপাত বাড়ছে। কমে আসছে আলো। এখনই পঞ্চাশ গজের বেশি দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না।

ঘুরে তাকানোর সাহস করল না কিশোর। তাকালেই যদি হাতের ইশারায় তাকে কাছে যেতে বলে। না গিয়ে পারবে না। হুকুম অমান্য করলে গুলি করেও বসতে পারে, এখানকার প্রহরীদের যা মতিগতি। কোন আইন নেই, কানুন নেই, বিচার নেই। এখনও যা করছে সে, তাতেও যে গুলি খাবে না, নিশ্চিত করে বলা যায় না। খোঁড়লের পাশ দিয়ে যাবার সময় জিজ্ঞেস করল, 'হয়েছে?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল রবিন।

'রেডি থাকো,' গাড়ি ঠেলতে ঠেলতে বলল কিশোর। বহু আকাঙ্ক্ষিত ধোঁয়া দেখার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে। যে কোন মুহূর্তে দেখা যাবে এখন। এমনিতে যথেষ্ট আড়াল তৈরি করেছে তুষার, তবে এতটা নয় যে খোড়ল থেকে বেরোতে গেলে দেখতে পাবে না, সবচেয়ে কাছে দাঁড়ানো প্রহরীটার চোখে পড়বেই। আর অন্য দিকে তাকিয়ে থাকার কারণে বেরোনোটা যদি চোখে না-ও পড়ে, পালাতে গেলে দেখে ফেলবেই এবং বিনা দ্বিধায় গুলি চালানো শুরু করবে তখন। যদি কোন কারণে জখম হয়ে যায় দলের কোন একজন, তাহলে যে কি বিপদে পড়বে সেটা

আর ভাবতে চাইল না কিশোর।

খোঁড়লটা ছাড়িয়ে কয়েক গজ এগিয়ে গেল সে। বেশি দূরে যেতে চাইছে না, কারণ যে কোন সময় দেখা দিতে পারে ধোঁয়া। সময় নষ্ট করার জন্যে ইচ্ছে করে হোঁচট খেল সে। এখনও বুঝতে পারছে না তার দিকে তাকিয়ে আছে কিনা প্রহরীটা। দু'তিন পা এগিয়ে আবার হোঁচট খাওয়ার ভান করল। ভার বেশি হয়ে গেল ঠেলার একদিকে। উল্টে গেল। হাতল ছুটে গেল হাত থেকে।

তোলার জন্যে নিচু হলো, চাবুকের মত শপাং করে উঠল কঠিন কণ্ঠ। ছুটে এসেছে প্রহরীটা, প্রায় পৌঁছে গেছে তার পেছনে। খোঁড়লের পাশ দিয়েই এসেছে। কিছু করেনি যেহেতু, নিশ্চয় চোখে পড়েনি খোঁড়লটার সামনের দেয়ালের পরিবর্তন। এতক্ষণে ফিরে তাকাল কিশোর। চাবুকটা কাঁধে ফেলে, রাইফেল শক্ত করে দাঁড়িয়ে আছে প্রহরী। কিশোরের আচরণ সন্দেহ জাগিয়েছে তার। কথা বলার জন্যে মুখ খুলল। কিন্তু বলার আগেই চোখ পড়ল কিশোরের পায়ের দিকে। হাঁ করা মুখ হাঁ-ই হয়ে রইল।

কিশোরের পকেটে পিস্তল আছে। কিন্তু বের করার সাহস করল না। করলে লোকটাকে গুলি করা ছাড়া উপায় থাকবে না, আর তাতে সতর্ক হয়ে যাবে বাকি প্রহরীরা। শুরু হয়ে যাবে গুলিবৃষ্টি।

কিন্তু পরিস্থিতি যা দাঁড়িয়েছে তাতে না করেও পারবে না। না করলে তার নিজেকে গুলি খেতে হবে। রাইফেল তুলতে শুরু করেছে লোকটা।

সমস্যার সমাধান করে দিলেন মিস্টার মিলফোর্ড। নিঃশব্দে খোঁড়ল থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়ালেন প্রহরীর পেছনে। ডান হাতে ধরা কাটা শিকলটা। ঘুরিয়ে গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে বাড়ি মারলেন লোকটার মাথায়। তাতে রয়েছে রাজ্যের আক্রোশ আর ঘৃণা। টুঁ শব্দ করল না প্রহরী। জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেল।

কাঁপা গলায় মিস্টার মিলফোর্ডকে ধন্যবাদ দিল কিশোর।

ঠিক এই সময় ধোঁয়া চোখে পড়ল তার। তুষারপাতের মধ্যেও কমলা রঙ আগুনের আভা দেখা যাচ্ছে।

রবিনও বেরিয়ে চলে এসেছে। আর দাঁড়িয়ে থাকার মানে হয় না।

'দৌড় দাও!' বলেই সামনের দিকে ছুটতে শুরু করল কিশোর।

এগারো

শুরু হলো নরক গুলজার। চিৎকার, চেঁচামেচি, হট্টগোল। গুলির শব্দ হলো একবার। বাতাসে ভর করে ভেসে আসতে শুরু করল ধোঁয়ার খণ্ড খণ্ড মেঘ। শুধু ধোঁয়া নয়, ছাই, পোড়া কাঠকুটোও আসতে লাগল। তুষারপাত না হলে স্ফুলিঙ্গও আসত। আগুন ধরে যেত দাহ্য শুকনো জিনিস যা পেত তাতেই। ঢালের গোড়ায় দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে দেখল কিশোর, আগুনের লম্বা একটা দেয়াল লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে কর্মক্ষেত্রের দিকে। মোটামুটি একটা আগুন চেয়েছিল সে, এ জিনিস কল্পনা করেনি। বাতাসে রজনের তীব্র গন্ধ। রজন এবং বাতাস, দুই জিনিস মিলে এ

অবস্থার সৃষ্টি করেছে।

মাথার ওপর দিয়ে জ্বলন্ত ফার নীড়ল উড়ে গিয়ে কয়লার ওপর পড়তে দেখে ঘাবড়ে গেল সে। যে পরিমাণ শুকনো লতাপাতা আছে জায়গাটাতে, পুরো পাহাড়টাই জ্বলে উঠতে পারে। ফারের জঙ্গলে আগুন ছড়িয়ে পড়লে—যেটাতে আশ্রয় নেয়ার কথা ভাবছে ওরা, পুরো অঞ্চলটা নরকে পরিণত হবে।

পায়ের নিচে পাথর, কয়লার টুকরো আর আলগা জিনিসের অভাব নেই। পা পড়লে হড়কে যায়। তার ওপর দিয়েই যতটা সম্ভব দ্রুত ছুটে পৌঁছে গেল বনের কিনারে। রবিন আর মিস্টার মিলফোর্ড ঠিক তার পেছনেই লেগে আছেন।

কোন দিকে না তাকিয়ে অন্ধের মত বনের দিকে ছুটতে লাগল ওরা। ঘন ধোঁয়ার জন্যে গাছ দেখা যাচ্ছে না। বেশি কাছে গেল না। মোড় নিয়ে ছুটল বাঁ দিকে, নদীর কাছে যাওয়ার জন্যে। ওটা পেরোতে হবে। কতদূরে আছে ওটা, জানে না। এ দিকটা কখনও দেখেনি। অনুমান করছে, সামনেই কোথাও পেয়ে যাবে।

কতখানি ছুটেছে বলতে পারবে না, তবে অনেক হবে। পেছন থেকে ডাক দিল রবিন, 'কিশোর, থামো। বাবা দৌড়াতে পারছে না।'

'আরে না না, থামার দরকার নেই,' মিলফোর্ড বললেন। 'শিকল পরে থাকতে থাকতে পা আড়ষ্ট হয়ে গেছে তো। খানিক দৌড়ালেই ঠিক হয়ে যাবে। এখন থেমো না, বিপদ হবে।...কোনদিকে যাচ্ছ?'

'নদীর দিকে। ব্রিজটার কাছে যেতে হবে।'

'পাহারা থাকতে পারে ওখানে।'

'তা পারে। দেখা যাক। যা-ই ঘটুক, শুকনো কাপড়ে ওপারে যেতে চাই আমি।'

আবার রওনা হলো কিশোর। আগের মত অত জোরে দৌড়াল না আর, মিস্টার মিলফোর্ড কুলিয়ে উঠতে পারেন না। বাতাস এখন তুষারকণায় ভরা। কিন্তু ঘন হয়ে গজানো গাছের ডালপাতার ভেতরে তুষার পড়তে পারছে না। কয়লা পাহাড়ে কি ঘটছে কে জানে। বুঝে হবেই বা কি, ভাবল। ওটা তো তার নিয়ন্ত্রণে নেই। গাছপালার ফাঁক-ফোকর দিয়ে তুষার আর ধোঁয়ার মধ্যে কমলা রঙের আভা দেখতে পাচ্ছে কেবল।

যতটা ভেবেছিল, তারচেয়ে দূরে নদীটা। পাওয়া গেল অবশেষে। তেমন চওড়া নয় এখানটায়। তবে যত কমই হোক, হেঁটে পেরোতে গেলে কাপড়-জামা আর শুকনো থাকবে না। পানির রঙ কালো। কতটা গভীর বোঝা যায় না। হাঁটতে গিয়ে যদি দেখা যায় সাঁতার কাটতে হবে, তাহলেই হয়েছে।

'ব্রিজ দিয়ে পেরোনোর চেষ্টাই করা উচিত,' কিশোর বলল।

নদীর পাড়ে বামন বার্চের জটলা, নিচু ডালওয়ালা উইলোও আছে। যতটা সম্ভব নদীর কিনার ঘেঁষে ওগুলোর মধ্যে দিয়ে হাঁটতে লাগল আবার সে।

'নদী পার হয়ে কোথায় যাবে?' জানতে চাইলেন মিস্টার মিলফোর্ড।

'প্লেনের কাছে। ল্যাগুনের ভেতরে নলখাগড়ার মধ্যে লুকিয়ে রেখেছি। এখান থেকে কয়েক মাইল হবে।'

আর কোন কথা হলো না। এক সারিতে এগোল ওরা। সবার পেছনে রইলেন

মিস্টার মিলফোর্ড। খানিক আগের হই-হট্টগোলের পর এখন অদ্ভুত নীরব লাগছে সব কিছু। তুষারের কণার আকার বড় হয়েছে আরও। ঘনও হয়েছে।

কিছুক্ষণ ধরে গাছের পাতায় তুষারপাতের একটানা ঝিরঝির শব্দই কেবল শোনা গেল, তারপর কানে এল নতুন একটা শব্দ।

ঝম! ঝম! ঝম! ঝম!

অদ্ভুত শব্দ। এই পরিবেশে কেমন যেন লাগে শুনতে। কিসের শব্দ বুঝতে অসুবিধে হলো না কারও। শিকলের। কাছেই কোনখান দিয়ে এগিয়ে চলেছে শিকল পরানো হতভাগ্য কয়েদীর দল।

হাত তুলে থামতে ইঙ্গিত করল কিশোর। নিচু স্বরে বলল, 'ওদের চলে যেতে দেয়া উচিত। পার হয়ে যাক।'

অপেক্ষা করতে লাগল ওরা। ভূতুড়ে শব্দটা চলে না যাওয়া পর্যন্ত নড়ল না।

সিকি মাইল মত পেরিয়েছে ওরা, এই সময় ঘটল একটা ঘটনা, তুষারঝড়ের সময় যেটা সচরাচর ঘটে না—হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল তুষার পড়া, যেন আচমকা রসদ ফুরিয়ে গেছে তুষারের। সামনে অনেকখানি জায়গা নজরে আসছে এখন। মুশকিল হলো, খোলা জায়গায় রয়েছে ওরা। বার্চের পরের জটলাটার মধ্যে যাওয়ার জন্যে দৌড় মারল। ঢুকে পড়ল তাতে। ওখান থেকে চারপাশে তাকিয়ে দেখতে লাগল কোথায় কি আছে।

কোথায় আছে চিনতে পারল। নদীর সেই অগভীর জায়গাটার কাছে চলে এসেছে ওরা, মিকোশা যেখান দিয়ে দৌড়ে পার হয়েছিল। বাঁ দিকে কিছুদূরে ধোঁয়া উড়তে দেখা যাচ্ছে এখনও। পাহাড়ের যেখানে আগুন লেগেছিল, পুড়ে কালো হয়ে আছে একটা বিরাট অংশ। ব্রিজটা রয়েছে সামনে তিনশো গজ দূরে। পায়ে চলা পথ ধরে ঘন সারিবদ্ধ ভাবে এগিয়ে চলেছে কয়েদীরা। দু'পাশ থেকে কঠোর পাহারা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাদের।

'এখানেই থাকি কিছুক্ষণ আমরা,' কিশোর বলল, 'ওরা না যাওয়া পর্যন্ত। বেরোতে গেলে যদি দেখে ফেলে মুশকিলে পড়ে যাব। তার চেয়ে অপেক্ষা করি।'

কেউ কোন প্রতিবাদ করল না।

'একজন গার্ড কম আছে,' আবার বলল কিশোর। 'তারমানে আঙ্কেল যেটাকে শিকল দিয়ে পিটিয়েছেন সেটা আসতে পারেনি। হয়তো মরেই গেছে। যদি না মরে, বেহুঁশ হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে হয়তো তুলে বয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে জেলখানায়। হেডগার্ডকে একটা ভাল সমস্যা উপহার দেবে সে।'

'কি করে?' রবিনের প্রশ্ন। 'হুঁশ ফেরাতে পারবে না বলে?'

'না,' মুচকি হাসল কিশোর। 'সে জানাবে এই বন্দি পালানোর পেছনে দুজন লোকের হাত আছে, দুজনের চেহারা একই রকম, একজনের পায়ে শিকল ছিল, আরেকজনের ছিল না। কিন্তু বাড়ি নিয়ে গিয়ে যখন গুনবে, দেখবে গায়েব হয়েছে মাত্র একজন লোক। তাহলে আরেকজন কোথায় গেল? গার্ডের সামনের লোকটা কে ছিল, শিকল খুলল কি করে, আর মাথায় বাড়িই বা মারল কে? মস্ত ধাঁধা না?'

'শিকল খোলা যে দেখেছে নাকি গার্ডটা?'

'অবশ্যই দেখেছে। আরেকটু হলে ওর চোখ কোটর থেকে বেরিয়ে চলে

আসছিল। শুধু সে-ই না, আঙ্কেলের সঙ্গে যে আরেকটা লোক কাজ করছিল সে-ও দেখেছে। আমার দিকে এমন করে তাকাচ্ছিল, ভয়ই পেয়ে গিয়েছিলাম। আরেকটু হলেই দিচ্ছিল খেল খতম করে। জেলখানায় নিয়ে গিয়ে যদি কয়েদীদের জিজ্ঞাসাবাদ করে, তাহলে নিশ্চয় এই লোকটা গার্ডের কথার সঙ্গে একমত হয়ে বলবে একজন কয়েদীর পায়ে শিকল ছিল না। জেলখানা কর্তৃপক্ষকে এটা ভাবিয়ে তুলবে।' মুখ ফিরিয়ে নদীর দিকে তাকাল কিশোর। 'ব্রিজের কাছে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। দলটা দূরে চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দৌড় দেব। তবে মাটিতে পড়া তুষার একটা মস্ত ক্ষতির কারণ হবে। পায়ের ছাপ পড়ে যাবে—শুধু আমাদেরই না, ওমর ভাই আর মুসার ছাপও পড়বে।'

'ওরাই তাহলে আগুনটা লাগিয়েছে?' জানতে চাইলেন মিস্টার মিলফোর্ড।

'হ্যাঁ।'

'কোথায় ওরা?'

'মনে হয় নিরাপদেই কেটে পড়েছে। ব্রিজের অন্যপাশে অপেক্ষা করছে এখন।'

'কিন্তু কই,' রবিন বলল, 'দেখা তো যাচ্ছে না।'

'ওরা কি আর অত বোকা, খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকবে। আছে কোনখানে, বনের ভেতর। নজর রাখছে আমাদের জন্যে।'

'জেলখানায় কি যেন হচ্ছে,' মিস্টার মিলফোর্ড বললেন।

ব্রিজের দিক থেকে চোখ ফেরাল কিশোর। খুলে গেছে জেলখানার গেট। তিনজন কসাক বেরিয়ে এসে এগিয়ে গেল শিকল পরা কয়েদীর দলটার দিকে।

সাবধান হয়ে গেল কিশোর। জরুরী কণ্ঠে বলল, 'ব্রিজের দিকে আসছে বোধহয়। আমাদের আগে পৌঁছে গেলে মরেছি, আটকা পড়তে হবে এ পাশটায়। গার্ডদের সঙ্গে কথা বলার জন্যে থামবে নিশ্চয়। মাত্র মিনিটখানেক সময় আছে আমাদের হাতে, দেরি করলে দেখে ফেলবে।'

ছুটতে শুরু করল কিশোর। কসাকদের দিকে চোখ রেখে বার্চের ভেতর দিয়ে এগোল। পিছে পিছে ছুটল অন্য দুজন।

ছুটতে ছুটতেই কিশোর বলল, 'যা ভেবেছিলাম। গার্ডদের সঙ্গে কথা বলে জেনে নেবে সব।' মিস্টার মিলফোর্ডকে বলল, 'দৌড় দিন।' রবিনের দিকে তাকাল, 'দৌড়াতে থাকো। কোন কারণেই থামবে না। ওরা এদিকে তাকানোর আগেই ব্রিজের কাছে পৌঁছে যাওয়া চাই আমাদের।'

কয়েদীদের কাছে গিয়ে ঘোড়া থামাল তিন কসাক। হেড গার্ডের সঙ্গে কথা বলতে চাইল বোধহয়, কারণ ওদের দিকে এগোতে দেখা গেল লোকটাকে।

'রেডি!' বলেই ব্রিজের দিকে ছুটল কিশোর।

দুশো গজ মত পেরোতে হবে। কসাকরা আছে তার প্রায় দ্বিগুণ দূরত্বে। তবে তাদের কাছে ঘোড়াও আছে।

ছুটতে ছুটতে অর্ধেক পথ চলে এসেছে কিশোররা, এই সময় দূর থেকে চিৎকার শোনা গেল: দেখে ফেলেছে ওদের। কোনদিকে তাকাল না কিশোর। দৃষ্টি নিবদ্ধ সামনে, রাস্তার দিকে, যেটা ধরে ব্রিজে পৌঁছানো যায়। অন্য কোনদিকে

তাকানোর চেয়ে এখন রাস্তার দিকে চোখ রাখাই জরুরী, কোন কারণে পা পিছলে পড়ে যাওয়া মারাত্মক বিপদ ডেকে আনবে। ছোট ছোট বাধা টপকে একনাগাড়ে ছুটল সে। ব্রিজের গোড়ায় গিয়েও থামল না। ব্রিজে উঠল। তারপর ফিরে তাকাল। পুরোদমে ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে তিন ঘোড়সওয়ার। শ'খানেক গজ দূরে রয়েছে আর।

রবিনের কাছ থেকে পিস্তলটা নিয়ে নিলেন মিস্টার মিলফোর্ড। শান্তকণ্ঠে দুই কিশোরকে বললেন, 'যাও, তোমরা ব্রিজ পেরোও। তোমরা না পেরোনো পর্যন্ত কভার করে রাখছি আমি।'

'কিন্তু...' বলতে গেল রবিন।

'যাও, জলদি করো! সব বাহাদুরি নিজেরাই নিতে চাও নাকি?'

রবিনের হাত ধরে টান দিল কিশোর, 'এসো, সময় নেই।'

কিশোরের পেছন পেছন ব্রিজের দিকে দৌড় দিল রবিন।

ঘোড়সওয়ারদের দিকে দুই বার গুলি করলেন মিস্টার মিলফোর্ড, জানানোর জন্যে যে তাঁর কাছেও পিস্তল আছে। কারও গায়ে গুলি লাগল না, তবে গতি কমাতে বাধ্য হলো কসাকরা। রাইফেল খুলে নেয়ার জন্যে ঘোড়া থামাল। সামান্য যে সময় পাওয়া গেল এই সুযোগে রবিন আর কিশোরের পেছন পেছন মিস্টার মিলফোর্ডও ব্রিজে উঠে পড়লেন।

উত্তেজনায় ওমর আর মুসার কথা ভুলেই গিয়েছিল রবিন। ওদের দেখে যেন অবাক হয়ে গেল।

হাত নেড়ে চিৎকার করে মুসা বলল, 'জলদি এসো, জলদি! কোনমতে পেরোও কেবল, তারপর জন্মের শিক্ষা দেয়া হবে ব্যাটাদের। এ পাড়ে আসতে হলে সাঁতার কাটা ছাড়া পথ পাবে না।'

পঞ্চাশ গজের মধ্যে এসে গেছে তিন কসাক। এগিয়েই আসছে। রাইফেলগুলো হাতে। তবে যে ভঙ্গিতে এগোচ্ছে, তাতে গুলি করে নিশানা ঠিক রাখতে পারবে কতখানি, যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

কিশোররা পার হয়ে চলে আসতেই পকেট থেকে কি যেন বের করে আনল মুসা। জোরে ছুঁড়ে মারল ব্রিজ লক্ষ্য করে। মাঝামাঝি জায়গার চেয়ে সামান্য দূরে পড়ল ওটা। চোখ ধাঁধানো তীব্র আলো। কানফাটা গর্জন। ধোঁয়া উঠতে শুরু করল। টুকরো-টাকরা ছিটকে উড়ে যেতে লাগল চতুর্দিকে।

আরও একবার একই জিনিস ছুঁড়ে মারল মুসা।

বাপের জন্মে এ রকম বদখত জিনিসের মুখোমুখি হয়নি বোধহয় ঘোড়াগুলো। ব্রিজের মুখের কাছে চলে এসেছিল। সামনের পা তুলে পেছনের পায়ে ভর দিয়ে খাড়া হয়ে গেল। বিকট এক ডাক ছাড়তে ছাড়তে ঘুরে দিল দৌড়। এক হাতে রাইফেল নিয়ে ওগুলোকে সামলাতে পারল না পিঠে বসা সওয়ারিরা। যার যেদিকে খুশি দৌড় মারল ঘোড়াগুলো।

'ইয়া হু!' বলে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল মুসা। 'গেছে! গেছে! ব্যাটাদের জারিজুরি খতম!'

বাতাসে ধোঁয়া উড়িয়ে নিয়ে গেল। দেখা গেল, ব্রিজের মাঝখানটা ধ্বংস হয়ে

গেছে। মস্ত এক ফোকর।

'খাইছে! কাণ্ডটা কি হলো!' হাসতে হাসতে বলল মুসা। 'জানো, কতকাল ধরে এ ধরনের কিছু করার জন্যে অস্থির হয়ে অপেক্ষা করেছি আমি। সিনেমায় শত্রুপক্ষের ব্রিজ ওড়ানো দেখলে হাত নিশপিশ করত।'

'হলো তো,' কিশোর বলল। 'নিশ্চয় হাত নিশপিশ বন্ধ হয়েছে এখন।'

জেলখানার দেয়ালে গর্ত করা লাগতে পারে ভেবে ডিনামাইটের স্টিক নিয়ে আসা হয়েছিল। তার থেকেই নিশ্চয় গোটা কয়েক পকেটে পুরেছিল মুসা।

'এনে ভালই করেছি, না কি বলো,' কিশোরের মনের কথা পড়তে পেরে যেন বলে উঠল মুসা। 'ভাবলাম, জেলখানার দেয়াল যখন ফুটো করা গেলই না, অন্য কিছু করা যাক।'

'আমাকে জানালে না কেন?'

'ভয়ে। হয়তো আনতে দিতে না।'

'হয়তো। ভাবতাম কাজে লাগবে না।'

চওড়া হাসিতে দুই পাটি দাঁত বেরিয়ে পড়ল মুসার। 'তাহলে স্বীকার করছ, এই একটিবার অন্তত চিন্তা-ভাবনার ক্ষেত্রে আমি তোমার চেয়ে এগিয়ে আছি...'

'বকবকানি থামাও,' বাধা দিল কিশোর। 'অনেক কাজ বাকি এখনও।' নিজের ঘোড়াটাকে সামলে ফেলেছে একজন সওয়ারি। দৌড়ে আসছে আবার নদীর দিকে। ব্রিজের কাছ থেকে কিছুটা উজানে রয়েছে।

'খারগা,' রবিন বলল।

'মিকোশা যেদিক দিয়ে নদী পেরিয়েছে,' অবাক হয়ে বলল কিশোর, 'সেদিকে যাচ্ছে। চলো, সময় থাকতে কেটে পড়ি। ও নদী পেরিয়ে চলে এলে ঝামেলা বাধাবে। এত কিছু করে আসার পর এখন আমাদের কারও জখম হওয়াটা কোন কাজের কথা নয়।'

'তা বটে,' রবিনও একমত হলো কিশোরের সঙ্গে। তাকিয়ে আছে খারগার দিকে। পানির কিনারে পৌঁছে গেছে খারগা। পানিতে নামাতে চাইছে ঘোড়াটাকে।

'একটা গুলি মেরে দিলে কেমন হয়?' কিশোরের দিকে তাকাল ওমর।

'কোন লাভ হবে না,' কিশোর বলল। 'এত দূর থেকে লাগাতে পারবেন না ওকে। তারচেয়ে গুলি বাঁচিয়ে রাখুন, ভবিষ্যতে কাজে দেবে।...চলুন এখন, যাওয়া যাক।'

সবে ঘুরতে যাবে সে, রাইফেলের গুলির শব্দ হলো।

'খাইছে!' বলে উঠল মুসা। 'আমরা না করলে কি হবে, অন্য কেউ গুলি করছে ওকে লক্ষ্য করে।...আরে আরে, লাগিয়ে ফেলেছে তো!'

খারগার হাত থেকে রাইফেল পড়ে গেল। ঘোড়াটার গলা চেপে ধরে পতন রোধ করতে চাইল। কয়েক সেকেন্ড যেন ঝুলে রইল ওই ভঙ্গিতে। ধীরে ধীরে পিছলে যাচ্ছে দেহটা। কোনমতেই জিনের ওপর বসে থাকতে পারল না আর। খসে পড়ে গেল মাটিতে। ওভারকোটের কোণটা আটকে রইল জিনের এক মাথায়। এদিক ওদিক দু'চারটা ছোট ছোট লাফ মারল ঘোড়াটা। খসাতে পারল না। তারপর ওকে নিয়েই দৌড়াতে শুরু করল। ঝাঁকি লেগে এক সময় কোণাটা ছিঁড়ে গেল।

মাটিতে পড়ে গেল খারগার লাশ। পানির এত কিনারে পড়ল, গড়িয়ে গিয়ে পড়ল পানিতে। বরফ শীতল পানিতে স্রোতে ভেসে এগিয়ে চলল মোহনার দিকে। জোর কদমে ছুটতে ছুটতে চলে গেল তার বাহন।

স্তব্ধ হয়ে এতক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে ছিল সবাই। অবশেষে মুখ খুললেন মিস্টার মিলফোর্ড, 'গুলিটা করল কে?'

'নিশ্চয় মিকোশা,' মুসা বলল।

'উঁহু,' মাথা নাড়ল কিশোর, 'আমার মনে হয় না। প্লেন ছেড়ে মিকোশা ওখানে যাবে না কোনমতেই।'

'ওহহো,' ওমর বলল, 'একটা কথা বলতে ভুলে গেছি, একটু আগে মারকভকে দেখলাম। আমরা যেখানে লুকিয়ে ছিলাম, তার কাছ দিয়ে দৌড়ে চলে গেল। আগুন লাগানোর পর এক পলকের জন্যে দেখেছি। বনের ভেতর দিয়ে চলে গেছে।'

'মারকভটা আবার কে?' জানতে চাইলেন মিস্টার মিলফোর্ড। 'তোমাদের কোন বন্ধু নাকি?'

'বন্ধুই বলতে পারো,' রবিন বলল। 'তবে সঙ্গে আসেনি, এই বনেই তার সঙ্গে দেখা হয়েছে আমাদের। খারগাকে খুন করার জন্যে পাগল হয়ে ছিল।'

'অনেকেই ওকে খুন করার জন্যে পাগল। ও কি মানুষ নাকি! নরকের শয়তান!...কিন্তু তার ওপর মারকভের এত আক্রোশ কেন?'

'মারকভ প্রাক্তন কয়েদী। শাখালিনে জেল খেটে এসেছে। ছাড়া পাওয়ার পর বনের মধ্যে কুঁড়ে বানিয়ে বাস করছিল। কিন্তু রেহাই দেয়নি তাকে খারগা। এসে এসে অমানুষিক অত্যাচার করে যেত।'

'অ। ওর জন্যে অপেক্ষা করবে নাকি?'

'না,' জবাব দিল কিশোর। 'আমাদের প্রতি তার কোন আগ্রহ নেই। এখান থেকে যাবে না সে। ওর একমাত্র ধ্যান-ধারণা এখন, ওই ভয়ঙ্কর কারাগারের যে পিশাচেরা অন্যায়ভাবে তার ওপর অত্যাচার করেছে, তার জীবনটাকে নরক বানিয়ে ছেড়েছে, এক এক করে তাদের খতম করা।'

'কিন্তু জেলখানায় হচ্ছেটা কি?' রবিন বলল। 'দেখো।'

গেটের কাছে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে শিকল পরানো কয়েদীদের। গেট দিয়ে বেরিয়ে এল ডজনখানেক ইউনিফর্ম পরা লোক। আলো কমে গেছে অনেক। তাতে কেমন অবাস্তব লাগছে দৃশ্যটা। জোড়ায় জোড়ায় দৌড়ে আসতে লাগল ওরা পায়েচলা পথটা ধরে।

'স্পেশাল ফোর্স,' মিস্টার মিলফোর্ড জানালেন। 'জেলখানায় গোলমাল-টোলমাল হলে ওদের তলব করা হয়। ইবলিস একেকটা।'

'এখানে দাঁড়িয়ে থাকা মোটেও ঠিক হচ্ছে না আমাদের,' ওমর বলল। 'সময় থাকতে চলে না গেলে পরে পস্তাতে হবে। গোলাগুলির শব্দ জেল থেকে শুনতে না পাওয়ার কথা নয়।'

'হ্যাঁ, চলুন,' কিশোর বলল।

আকাশের দিকে তাকাল ওমর। 'তুষারপাত কিন্তু একেবারে বন্ধ হয়নি। আবার হবে। অনেক বেশিই হবে এবারে। তাতে পড়বে পায়ের ছাপ। স্পেশাল ফোর্স ব্রিজ

পেরোলেই জেনে যাবে কোনদিকে গেছি আমরা।'

রওনা হলো ওরা। আগে আগে চলল ওমর। সবার পেছনে মিস্টার মিলফোর্ড। পা টেনে টেনে চলেছেন তিনি। একপায়ে সামান্য ব্যথা পেয়েছেন।

চলতে চলতে কান পাতল ওমর। কানে আসছে রাইফেলের গুলির শব্দ।

'আবার কে?' মুসার প্রশ্ন।

'নিশ্চয় মারকভ,' রবিন বলল। 'প্রতিশোধের মাত্রা বাড়িয়েই চলেছে সে।'

'রাইফেল পেল কোথায়?' জানতে চাইলেন মিস্টার মিলফোর্ড।

'একজন গার্ডকে খুন করে কেড়ে নিয়েছে।'

রবিনের কথায় সুর মিলিয়ে কিশোর বলল, 'আমাদের জন্যে উপকারী বন্ধু। বনের মধ্যে যদি লুকিয়ে বসে থাকে সে, ব্রিজ পার হওয়া কঠিন হয়ে যাবে স্পেশালই হোক, আর যে ফোর্সই হোক, সবার জন্যে। নদী পেরোতে গেলেই মরবে।'

বারো

আবহাওয়া সম্পর্কে ওমরের ভবিষ্যদ্বাণী ফলে গেল। বেশিদূর এগোতে পারল না, তার আগেই তুষারপাত শুরু হয়ে গেল আবার। আর এবার শুরু হলো ভালমত। পাঁচ মিনিটের মধ্যে প্রবল তুষার-ঝড় ঠেলে এগোনো লাগল ওদের। পায়ের নিচে ইঞ্চিখানেক তুষার জমে গেল। এত স্পষ্ট চিহ্ন রেখে যেতে শুরু করল, আধা অন্ধ একজন মানুষও সেটা অনুসরণ করে যেতে পারবে স্বচ্ছন্দে। যদিও পড়তে না পড়তে তুষারে ছাপগুলো ঢেকে যাচ্ছে আবার। কিন্তু হাঁটার সময় নতুন ছাপ রেখেই চলেছে ওরা। হঠাৎ করে যদি তুষার পড়া বন্ধ হয়ে যায়, পরের ছাপগুলো থেকে যাবে। অনুসরণকারীকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবে কোথায় চলেছে ওরা।

ঝড়টা রীতিমত উদ্বিগ্ন করে তুলেছে ওমরকে। সে জানে, এই আবহাওয়ায় কোনমতেই বিমান ওড়ানো যাবে না। যদি তুষারপাত বন্ধও হয়ে যায়, তাহলেও সম্ভব না—কারণ, বিপুল পরিমাণ তুষার জমে যাবে বিমানের গায়ে; এত ভার নিয়ে উড়তেই পারবে না।

মিস্টার মিলফোর্ডকে জিজ্ঞেস করল ওমর, 'আচ্ছা, আপনি তো ভাল জানেন, এখানে কিভাবে কাজ চালায় ওরা? এ রকম আবহাওয়ায়ও কি খোঁজাখুঁজি চালিয়ে যাবে?'

মিস্টার মিলফোর্ড বললেন, 'খুঁজবে, তবে কিছু বিশেষ জায়গায়। বেছে বেছে কিছু কিছু জায়গায় প্যাহারা বসিয়ে দেবে। এই যেমন, মাছধরা নৌকা, কুঁড়েগুলো—যেখানে যেখানে খাবার পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। কারণ কেউ পালালে প্রথমে তার দরকার খাবার।'

'তাহলে আর আমাদের টিকির নাগালও পাবে না ওরা।'

বনের ভেতর দিয়ে চলছিল বলে বাঁচল। একজন কসাককে রাস্তা দিয়ে চলে যেতে দেখা গেল। ল্যাগুনটা আধ মাইল দূরে এখনও। গাছের গায়ে আর্তনাদ করে ফেরা বাতাস, তীরে আছড়ে পড়া ঢেউ, আর তুষারপাতের মিলিত শব্দ এতটাই প্রবল

যে ঘোড়াটার খুরের শব্দ শুনতেই পায়নি ওরা। ছায়ার মত হঠাৎ উদয় হলো লোকটা। বনের বাইরে থাকলে ভীষণ বিপদে পড়ত ওরা। কিশোর দেখল, ঘোড়ার পিঠে বসে নিচু হয়ে তুষারের মধ্যে কি যেন দেখতে দেখতে চলেছে লোকটা। নিশ্চয় পায়ের ছাপ খুঁজছে।

'সাবধান থাকতে হবে আমাদের,' ওমর বলল। 'লোকটা ফিরে আসার সময় যেন দেখা হয়ে না যায় আবার।'

'আমরা তো সাবধানই আছি,' কিশোর বলল। 'কিন্তু মিকোশা? তাকে যদি দেখে ফেলে?'

'বলেছে তো সাবধানে থাকবে। তাছাড়া ও এত সহজে ধরা পড়ার বান্দা নয়। এতগুলো গার্ডের চোখের সামনে থেকে পালানোর বুদ্ধি আর সাহস যার থাকে, তাকে একটা মাত্র কসাক কোনমতেই কাবু করতে পারবে না। দেখা যাবে কসাকটাকেই মেরে ফেলেছে সে।'

গাছপালার ফাঁক-ফোকর দিয়ে এগিয়ে চলল ওরা। রাস্তায় বেরোনোর যা-ও বা সামান্য ইচ্ছে ছিল, কসাকটাকে দেখার পর সে-চিন্তা বাদ দিয়ে দিল। বনের ভেতরে থেকে এমন জায়গা দিয়ে হাঁটছে যাতে রাস্তা দিয়ে কেউ গেলে চোখে পড়ে, বিশেষ করে যে কসাকটা গেছে তাকে।

হঠাৎ থমকে দাঁড়াল ওমর। সামনে থেকে পর পর দুটো গুলির শব্দ শোনা গেছে। ঝড়ের শব্দের জন্যে ঠিক বোঝা গেল না কোনখান থেকে এসেছে।

'দুটো আওয়াজ দুই রকম লাগল। তারমানে দুটো ভিন্ন অস্ত্র থেকে গুলি দুটো হয়েছে,' ওমর বলল। 'আমার ভাল লাগছে না ব্যাপারটা। মনে হচ্ছে মিকোশাকে সই করে গুলি করেছিল কেউ, মিকোশা পাল্টা জবাব দিয়েছে। কিংবা উল্টোটাও হতে পারে।'

এগিয়ে চলল ওরা। মিনিটখানেক পরেই কসাকটাকে রাস্তা ধরে আসতে দেখা গেল। ফিরে গেল যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে।

'যাওয়ার কায়দা দেখে তো মনে হলো তাড়াহুড়া আছে,' ওমর বলল। 'তারমানে কিছু দেখে এসেছে।'

'কি দেখবে? প্লেনটা দেখেছে বলে মনে হয় না আমার। পাঁচ-সাত গজের বেশি দৃষ্টি চলছে না। দেখবে কি করে?'

'অত অনুমান-টনুমান করে লাভ নেই,' ওমর বলল। 'মিকোশার সঙ্গে দেখা হলেই জানা যাবে কি হয়েছে।...যদি তাকে পাওয়া যায় ওখানে...'

'আপনি কি ভাবছেন...'

'সত্যি কথা হলো, গুলির শব্দটা আমার ভাল লাগেনি। জলদি চলো।'

অনেক অনিশ্চয়তার মধ্যে দিয়ে বাকি রাস্তাটা শেষ করল ওরা। ঝড়ের গতি বাড়ছে আরও, কমার কোন লক্ষণই নেই। কিছুক্ষণ চলার পর ওমর বলল, 'ল্যাগুনটা পার হয়ে চলে গেলে পড়ব মহা বিপদে। এই ঝড়ের মধ্যে তখন প্লেনটাকে খুঁজে বের করা হবে অসম্ভব। হারিয়ে যাব।' গলা চড়িয়ে হাঁক দিল মিকোশার নাম ধরে।

জবাব নেই।

কয়েকবার ডেকে ডেকে সাড়া না পেয়ে আরও পঞ্চাশ গজমত এগোল ওমর।

তারপর আবার ডাক দিল। এবারেও সাড়া নেই।

'কসাকটা ওকে গুলি করে মেরে রেখে গেলে,' কিশোর বলল, 'সারাদিন চেঁচালেও সাড়া পাব না।'

জবাব দিল না ওমর। আরও কয়েক গজ এগোল। ডাক দিল আবার, 'মিকোশা, মিকোশা' বলে।

এইবার সাড়া এল, জবাব দিল মিকোশা, 'এই যে, আমি এখানে।'

হাঁপ ছেড়ে বাঁচল সবাই।

আরও কয়েক কদম এগোনোর পর দেখা পাওয়া গেল তার।

'আমরা তো চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম,' ওমর বলল। 'ভাবলাম গুলি করে ফেলে রেখে গেছে বুঝি আপনাকে।'

তার কথার জবাব দিল না মিকোশা। তাকিয়ে রয়েছে মিস্টার মিলফোর্ডের দিকে। ধীরে ধীরে হাসি ফুটল মুখে। চওড়া হলো হাসিটা। হাত বাড়িয়ে দিতে দিতে বলল, 'মুক্তি তাহলে পেলেন।'

'হ্যাঁ, পেলাম,' হাতটা ধরলেন মিস্টার মিলফোর্ড। 'কিন্তু ওসব কথা পরে হবে।...গুলির শব্দ যে শুনলাম, ব্যাপারটা কি?'

'আমাকেই করেছিল,' মিকোশা জানাল, 'মিস করেছে। তবে মিস হয়ে যে ক্ষতিটা হয়েছে, সেটাও কম ভয়ঙ্কর নয়।'

'কি করেছে?' জিজ্ঞেস করল ওমর।

'ডিঙিটা ফুটো করে দিয়েছে।'

'কি করেছে!' ক্ষতির ভয়াবহতা প্রথমে যেন মগজেই ঢুকল না ওমরের।

কিশোর জানতে চাইল, 'কি করে ঘটল এই সর্বনাশ? আপনার না পাহারা দেয়ার কথা ছিল?'

'বিশ মিনিট আগে পর্যন্ত তা-ই দিচ্ছিলাম,' মিকোশা জানাল। 'তারপর তুষার জমা শুরু হলো এমন করে, ঘাবড়ে গেলাম। ভাবলাম, ভরতে ভরতে ডিঙিটা না ডুবে যায়। তাই বোকার মত গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে দেখতে গেলাম ওটাকে।'

'ঠিকই করেছেন,' ওমর বলল। 'তা-ই তো করার কথা।'

'গিয়ে দেখি অর্ধেক ভরে গেছে ওটা। কাত হয়ে গেছে একপাশে। সোজা করার চেষ্টা করছি, এই সময় কোত্থেকে ঘোড়ায় চেপে ভূতের মত এসে উদয় হলো শয়তানটা। একটু শব্দও শুনিনি। হঠাৎ কি মনে হলো আমার, মুখ তুলে দেখি আমার দিকে তাকিয়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে পিস্তল বের করলাম। সে-ও বের করল। গুলি করলাম। তাড়াহুড়োয় মিস করলাম। সে-ও গুলি করল। আমার মতই মিস করল। ডিঙিটার দিকে চোখ পড়তে ফাটা বেলুনের মত চুপসে গেলাম, ওটাও বেলুনের মতই চুপসে গেছে। আমাকে যে গুলিটা করেছিল সেটা লেগেছে ডিঙিতে। তুষারের চাপে চাদরের মত চ্যাপ্টা হয়ে গেল ওটা, আমি কিছু করার আগেই।'

'ফুটো হয়ে গেলে আর আপনি কি করবেন। কোথায় এখন ওটা?'

ডিঙিটার কাছে ওদেরকে নিয়ে গেল মিকোশা। বাতাস বেরিয়ে চ্যাপ্টা হয়ে গেছে। তুষারে চাপা পড়া। অর্ধেকটা রয়েছে পানির তলায়, অর্ধেক ডাঙায়।

'সত্যি বলছি, মাথার চুল সব ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে করছে এখন আমার,' মিকোশা বলল।

'অত দুঃখ পাবার কিছু নেই,' সান্ত্বনা দিল ওমর। 'আপনার দোষ নয়। আপনার জায়গায় আমি হলেও এ-ই করতাম।'

'বিশ্বাস করুন, ডিঙিটা বাঁচাতেই চেয়েছিলাম আমি।'

'বললাম তো, ভুলে যান। ডিঙিটা তো গেছেই, ওটা নিয়ে আর মন খারাপ করে কি হবে। ওটাকে মেরামতের কোন উপায় নেই, ফোলানোও যাবে না।'

ডিঙি নেই। বিমানে যাওয়াটা এখন এক মস্ত সমস্যা।

কিশোর বলল, 'ডিঙি ছাড়া প্লেনে গিয়ে উঠতে পারব না। এখানে বসে বসে ঝড় থামার অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। কসাকটা এত তাড়াহুড়ো করে চলে গেল কেন, বোঝা যাচ্ছে এখন।'

'দলবল নিয়ে আসতে গেছে,' রবিন বলল।

'হ্যাঁ। ডিঙিটা যদি দেখে থাকে সে–আমার ধারণা নিশ্চয় দেখেছে, তাহলে জেলখানার কর্তৃপক্ষরা পরিষ্কার জেনে যাবে উটকো ঝামেলাটা কোনখান থেকে এসেছে।'

তিক্তকণ্ঠে মিস্টার মিলফোর্ড বললেন, 'বেশ চমৎকার একখান সমস্যা তৈরি করে দিয়ে গেল!'

'শুধু সমস্যা নিয়ে বসে থাকলে চলবে না, সমাধান তো একটা বের করতে হবে,' দমল না কিশোর।

'কিন্তু আমি তো কোন উপায় দেখছি না।'

'আছে, নিশ্চয় আছে,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর, 'খুঁজে বের করতে হবে আরকি উপায়টা।'

'প্লেনটা তীরে নিয়ে আসার চেষ্টা করলে কেমন হয়?'

'প্লেনে উঠতে পারলে তবে তো আনা,' কিশোর বলল। 'উঠতেই যদি পারা গেল, তাহলে আর আনার দরকার কি। সাঁতরে যাওয়ার কথা ভাবছেন তো? পানির তাপমাত্রা শূন্যের কাছাকাছি। এর মধ্যে সাঁতরানো, তা-ও আবার ঘন নলখাগড়ার ভেতর দিয়ে–অসম্ভব! কোনমতেই পারবেন না।'

চুপ হয়ে গেল সবাই।

কয়েক সেকেন্ড চিন্তা করে কিশোর বলল, 'রবিন, মারকভের একটা নৌকা আছে, মনে আছে?'

'আছে। কিন্তু পাব কোথায়? মারকভ যাওয়ার সময় নিশ্চয় সঙ্গে করে নিয়ে গেছে। যতই পালাক, খাওয়ার জন্যে মাছ ধরতে হবে ওকে, আর মাছ ধরার জন্যে নৌকা দরকার।'

'আছে কিনা, গিয়ে দেখতে দোষ কি?'

'দোষ নেই, তবে মাইলখানেক হাঁটতে হবে এই আরকি। যদি পাওয়া যায়ও, এতদূর বেয়ে আনা যাবে না এই ঝড়ের মধ্যে।'

'বেয়ে আনার কথা কে ভাবছে?' জবাব দিল কিশোর। 'বয়ে আনব।'

'তা আনা যায়। কিন্তু সময়মত ওখানে গিয়ে পৌঁছতে পারব? সৈন্যরা যদি চলে

আসে?'

'আসবে তো জানা কথাই, তবে সময় লাগবে। ব্রিজটা ভাঙা, রাইফেল নিয়ে পাহারা দিচ্ছে মারকভ, নদী পেরোনোই কঠিন হয়ে যাবে ওদের জন্যে।...মারকভের নৌকাটাই এখন একমাত্র ভরসা আমাদের। একসঙ্গে সবাই ওতে না উঠতে পারলে ভাগাভাগি করে পেরোব।...নৌকা আনতে সবার যাওয়ার দরকার নেই। মিস্টার মিকোশা, আপনি থাকুন এখানে। আঙ্কেল, আপনিও থাকুন। এতদিন ধরে জেলে থেকে থেকে, ওদের খাবার খেয়ে নিশ্চয় কাবু হয়ে গেছেন–আর আজকে তো যে খাটুনিটা খাটলেন।'

'মোটেও ক্লান্ত হইনি আমি,' মিস্টার মিলফোর্ড বললেন। 'এখানে দাঁড়িয়ে থাকার চেয়ে বরং সঙ্গে আসি, তোমাদের কাজে লাগব। আর কিছু না পারি, তোমাদের পেছনে দাঁড়িয়ে পাহারা তো দিতে পারব। আমাকে ডিঙিয়ে গিয়ে কেউ তোমাদের ছুঁতে পারবে না।'

'তা আমি জানি,' হেসে বলল কিশোর। 'ঠিক আছে। চলুন, যাওয়া যাক। মিকোশা, ডিঙিটা তো আর আমাদের কোন কাজে লাগছে না, এটাকে ভালমত ডুবিয়ে দিন। কসাকরা ফিরে এসে যাতে কোন চিহ্ন না দেখে, বুঝতে না পারে কোনখানে দেখে গিয়েছিল এটা। আমরাও যাতে দেখতে না পেয়ে পার হয়ে চলে না যাই সেদিকেও খেয়াল রাখবেন।'

'কি করে বুঝব, তোমরা এলে, নাকি কসাকরা?'

'আমরা হলে তো নৌকাটা বয়ে আনতেই দেখবেন। যদি আর না ফিরি, আপনার যা ইচ্ছে হয় করবেন তখন। যদি মনে হয়, আমরা আর ফিরব না, এই তুষার-ঝড় না থামা পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন। তারপর প্লেন নিয়ে ফিরে যাবেন আমেরিকায়। রকি বীচের বিখ্যাত গোয়েন্দা মিস্টার ভিক্টর সাইমনকে খবর দেবেন। আপনার কাজ শেষ।'

উজানের দিকে ফিরে চলল আবার চারজন হতাশ অভিযাত্রী। পেছন থেকে ঝাপটা মারছে এখন প্রচণ্ড ঝোড়ো হাওয়া। সুবিধে হচ্ছে এতে। বাতাসের অনুকূলে যাচ্ছে বলে কখনও দৌড়ে, কখনও জোরে হেঁটে এগিয়ে চলল দ্রুত। নৌকাটা কোথায় আছে সেটা রবিন জানে, সে-জন্যে সবার আগে রয়েছে সে, আর সবার পেছনে মিস্টার মিলফোর্ড। ওমর আর তাঁর হাতে পিস্তল। উল্টো দিক থেকে শত্রুপক্ষকে আসতে দেখলেই নির্দ্বিধায় গুলি চালাতে প্রস্তুত।

সব কিছু তুষারে ঢাকা। সব দেখতে এক রকম। সন্দেহ জাগল রবিনের, মারকভের কুঁড়ে খুঁজে পাবে তো!

সন্দেহটা ঠিকই হয়েছে তার। বার বার থেমে, কিশোরের সঙ্গে আলোচনা করে বোঝার চেষ্টা করল, কোনখানে আছে জায়গাটা। যাই হোক, অবশেষে খুঁজে পাওয়া গেল বনের ভেতরের পরিষ্কার করা খোলা জমি, যেখানে মারকভের কুঁড়ে। ওখান থেকে কতদূরে কোনখানে আছে নৌকাটা, ধারণা আছে রবিনের। ঘুরে সেদিকে এগোল।

কিন্তু নৌকাটা দেখল না। সহজে দেখবে আশাও করেনি। কয়েক ইঞ্চি পুরু হয়ে জমেছে তুষার। তার নিচে ডেবে গেছে নিশ্চয়। পানির কিনারে উঁচু হয়ে থাকা

ছোট ছোট ঢিবিগুলোকে লাথি মেরে মেরে ভাঙতে শুরু করল সবাই মিলে। নৌকার সমান উঁচু ঢিবি খুব বেশি নেই। কয়েক মিনিট পর তিক্ত সত্যটা প্রকট হলো। নৌকাটা নেইই ওখানে।

'নিশ্চয় সরিয়ে ফেলেছে মারকভ,' রবিন বলল।

'তারমানে সময় নষ্ট করছি আমরা,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল ওমর। 'কোথায় নিয়ে গিয়ে রেখেছে, তা কি করে জানব!'

কিন্তু এতেও দমল না কিশোর। রবিনকে নিয়ে খুঁজে বেড়াতে লাগল। হঠাৎ বনের ভেতর থেকে কথা বলে উঠল একটা কণ্ঠ। ফিরে তাকিয়ে দেখা গেল, তুষারের চাদরের আড়ালে অস্পষ্ট একটা সচল মূর্তি। ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে।

'মারকভ! মারকভ!' চিৎকার করে উঠল রবিন।

'কি বলছে ও?' জানতে চাইল কিশোর।

'কি খুঁজছি আমরা জিজ্ঞেস করছে।'

'বলো, ওর নৌকাটা খুঁজছি।'

নৌকাটা কোথায় জিজ্ঞেস করল রবিন।

বিচিত্র পোশাকে এই ঝড়ের মধ্যে অদ্ভুত লাগছে মারকভকে। সারা গায়ে তুষারকণা লেগে আছে। কোমরে কুড়াল। হাতে রাইফেল।

তার সঙ্গে কথা বলে রবিন জানাল, 'নৌকাটা তুলে এনে লুকিয়ে রেখেছে সে। বেশি দূরে না, কাছেই আছে। ওর ধারণা হয়েছিল, কসাকগুলো এসে বিপদে ফেলবে আমাদের। সাহায্য লাগতে পেরে ভেবে এখানে অপেক্ষা করছিল।'

'ওকে বলো, আমাদের নৌকাটা নষ্ট করে দিয়ে গেছে এক কসাক,' কিশোর বলল। 'জিজ্ঞেস করো, ওরটা ধার দেবে কিনা।'

সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেল মারকভ। বনের ভেতর নিয়ে গেল ওদেরকে। নৌকাটা কোথায় রেখেছে দেখাল। একমাত্র দাঁড়টা পড়ে আছে নৌকার মধ্যে। ঘন ডালপাতাওয়ালা গাছের নিচে থাকায় ভেতরে তুষার পড়েনি। এটা একটা স্বস্তি। তুষার সাফ করা লাগল না।

নৌকাটা বয়ে নিতে ওদের সাহায্য করল মারকভ। বাতাস এখন মুখোমুখি। এগোনোটা এমনিতেই কঠিন, তার ওপর যুক্ত হয়েছে নৌকার বোঝা, এবং তার ওপর নৌকার গায়ে বাতাসের ঝাপটা; এত প্রতিকূলতার মধ্যেও স্বস্তি পেল কিশোর–নৌকাটা পাওয়া গেছে, আর তুষারপাত ওদের পায়ের চিহ্ন ঢেকে দিচ্ছে। অদ্ভুত ব্যাপার, গন্তব্যে যখন পৌঁছাল, মিকোশা ওদের থামতে বলল, তখন প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াইটা থেমে যাওয়াতে কেমন হতাশই লাগল কিশোরের।

পানিতে নামানো হলো নৌকা। মাত্র দুজন লোক ধরে, তাতেই ডুবু ডুবু। তার মানে দুজন করে যাবে বিমানে, একজনকে নামিয়ে দিয়ে অন্যজন নৌকা নিয়ে ফিরে আসবে, তখন যাবে আরেকজন। অর্থাৎ প্রতিবারে একজন করে লোক প্লেনে উঠতে পারবে।

প্রথমে মিস্টার মিলফোর্ডকে তুলে দিয়ে আসতে বলল ওমর। প্রতিবাদ করলেন না তিনি। করে লাভ নেই। কেউ শুনবে না তাঁর কথা। অহেতুক সময় নষ্ট। উঠে পড়লেন নৌকায়।

বাইতে গিয়ে মিকোশা দেখে, নৌকা ওল্টানোর কোন সম্ভাবনা নেই। নলখাগড়ার ফাঁক-ফোকর দিয়ে এগোনোর সময় গাছগুলো এক ধরনের ভারসাম্য তৈরি করে দিচ্ছে। ঢেউও তেমন উঠতে দিচ্ছে না। অথচ নদীতে এখন বড় বড় ঢেউ।

তুষারের চাদরের আড়ালে নৌকাটা অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখল কিশোর। উদ্বিগ্ন হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। মনে হলো বহু যুগ পরে আবার নৌকা নিয়ে ফিরে এল মিকোশা। এরপর গেল মুসা। মিকোশাকে নামিয়ে দিয়ে ফিরে এল। তারপর গেল কিশোর। সে নৌকা ভাল বাইতে পারে না। সুতরাং তাকে নামিয়ে দিয়ে আবার মুসাকেই ফিরে আসতে হলো। এরপর কে যাবে এ নিয়ে ঠেলাঠেলি। রবিন যুক্তি দেখাল, ওমরের চলে যাওয়া উচিত। সে নিজে গেলে মারকভের সঙ্গে কথা বলার লোক থাকবে না। চাপাচাপি করল না ওমর। চলে গেল। ফিরে এল মুসাকে নামিয়ে দিয়ে।

নৌকায় চাপল রবিন। ওমরকে নামিয়ে দিয়ে ফিরে এল সে। মারকভকে অনুরোধ করল, তাকে নামিয়ে দিয়ে আসতে।

পৌঁছে দিল মারকভ।

প্লেনের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে কিশোর। রবিনকে বলল, 'ওকে জিজ্ঞেস করো, আমাদের সঙ্গে যাবে কিনা।'

মাথা নাড়ল রবিন। বলল, 'না, যাবে না। জিজ্ঞেস করেছিলাম। ও বলেছে, আমাকে নামিয়ে দিয়ে তীরে ফিরে যাবে। নৌকাটা লুকিয়ে রেখে ঢুকে যাবে জঙ্গলে। তারপর কসাকদের বিরুদ্ধে আসল যুদ্ধটা শুরু হবে ওর। যতজনকে পারবে, খতম করবে। এত জনের সঙ্গে একা পারবে না, শেষ পর্যন্ত মরতে হবে ওদের হাতে, জানে সে; কিন্তু কেয়ার করে না। জীবনের কোন দাম নেই এখন ওর কাছে, মৃত্যুর পরোয়া করে না।'

'হুঁ,' বিষণ্ন ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

ওর কাঁধের ওপর দিয়ে উঁকি দিল মুসার মুখ। রবিনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ওকে জিজ্ঞেস করো না, কিছু খাবার নেবে কিনা? তাতে কিছুটা অন্তত মনে শান্তি পাব। আমাদের জন্যে অনেক করেছে ও।'

খাবার নিতে রাজি হলো মারকভ।

কিশোরের পেছন থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল মুসা। ফিরে এল কয়েক মিনিটের মধ্যে। দুই হাতে করে যতগুলো সম্ভব টিন নিয়ে এসেছে। বলল, 'সব দিয়ে দাও। আমাদের তো আর বেশিক্ষণ থাকা লাগছে না। ফিরে গেলেই খাবার পাব। ও পাবে না।'

সে আর কিশোর মিলে টিনগুলো রবিনের হাতে দিতে লাগল। নৌকার তলায় সেগুলো সাজিয়ে রাখল রবিন।

ধন্যবাদ দিল তাকে মারকভ।

বিমানে উঠল রবিন। ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে উঠতে ইচ্ছে করছে না। অদ্ভুত এক মায়া।

ওর দিকে তাকিয়ে শেষবারের মত বিদায় জানিয়ে দাঁড় বাইতে শুরু করল

মারকভ। দূরে যেতে যেতে একসময় মিলিয়ে গেল তুষারের চাদরের আড়ালে। চিরকালের জন্যে।

'কোনদিন আর দেখা হবে না ওর সঙ্গে!' গলা ধরে এল রবিনের। আজব এক বিষণ্ণতা।

জবাব দিল না কিশোর বা মুসা। মারকভ আর তার নৌকাটা অদৃশ্য হয়ে যাবার পরেও অনেকক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে রইল তিনজন।

'চলে গেছে?' কেবিন থেকে জানতে চাইল ওমর।

'হ্যাঁ,' জবাব দিল মুসা।

'দরজাটা লাগিয়ে দাও। ঠাণ্ডা ঢুকছে।'

কেবিনে ঢুকল ওরা। চেয়ারে নেতিয়ে আছেন মিস্টার মিলফোর্ড। এতক্ষণে ক্লান্তি লাগছে তাঁর। প্রচণ্ড ক্লান্তি। গত কয় মাসে ভয়াবহ ধকল গেছে শরীরের ওপর দিয়ে।

ল্যাগুনে ঢেউ পুরোপুরি ঢুকতে না পারলেও যা ঢুকছে, তাতেই বেশ দুলছে বিমান।

'প্রচুর তুষার জমেছে গায়ে,' ওমর বলল। 'ডানাগুলোতে কয় ইঞ্চি পুরু হয়েছে, খোদাই জানে। বিরাট বোঝা।'

'তাতে কি খুব অসুবিধে হবে?' জানতে চাইলেন মিস্টার মিলফোর্ড।

'হবে, যদি জমাট বেঁধে বরফ হয়ে যায়। আলগা থাকলে ঝেড়ে ফেলতে পারব। ঝাঁকি লাগলেও আপনাআপনি ঝরে যাবে।' থামল ওমর। কান পেতে শুনল বাইরে বাতাসের শব্দ। 'মনে হচ্ছে ঝড় খুব বেশিক্ষণ আর থাকবে না। তবে ঢেউ না কমলে উড়তে পারব না। এত ঢেউয়ে রান করানো যাবে না।'

'তারমানে রাতটা থাকতে হচ্ছে এখানেই,' কিশোর বলল। 'ঠিক আছে; কি আর করা। আমি ছদ্মবেশ খুলে আসছি।'

বাথরুমের দিকে চলে গেল সে। ছদ্মবেশ বলতে এখন কেবল পরচুলাটাই আছে, রঙ-টঙ সব ধুয়ে চলে গেছে কখন। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ফিরে এল সে।

স্টোভ ধরিয়ে কফির পানি চড়িয়ে দিয়েছে ততক্ষণে মুসা।

তেরো

বাকি রাতটা কসাকদের উৎপাত ছাড়াই কেটে গেল কোনমতে। অস্বস্তি আর উদ্বেগে ভরা একটা দুর্যোগের রাত। সারারাত বিমানটাকে নিয়ে খেলা করল যেন বাতাস। একটু পর পরই টান মারে, হ্যাঁচকা টানে ছিঁড়ে ফেলতে চাইল শিকল, নোঙর উপড়ানোর পাঁয়তারা করল। ফলে কেউ ঠিকমত ঘুমাতে পারল না। চেয়ারে বসে ঢুলতে লাগল, আর চমকে চমকে উঠল বার বার। ভোর যখন হলো, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সবাই। বাইরের অবস্থা দেখার জন্যে দরজা খুলে উঁকি দিল কিশোর।

তুষারপাত থেমে গেছে। তাপমাত্রা বেড়েছে খানিকটা। মেঘের ফাঁকে ফাঁকে

উঁকি দিচ্ছে কেমন পানি-ভরা নিস্তেজ সূর্য। বাতাসের গতি অনেক কম। ঝড় থেমেছে অবশেষে। ঘন নলখাগড়ার বনে আশ্রয় নেয়া হাঁসেরা ফিরে আসতে শুরু করেছে। রাস্তার দিকে তাকাল সে। কাউকে চোখে পড়ল না। ফারের ডালে জমা তুষার বোঝা হয়ে গিয়ে খসে খসে পড়ছে।

পাশে এসে দাঁড়াল ওমর। মোহনার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ঢেউ এখনও যথেষ্ট। তবে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে কমে যাবে আশা করছি। তখন ওড়া যাবে। ততক্ষণে ডানা আর পিঠে জমা তুষারও ঝরে যাবে অনেক।'

অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছু করার নেই। রাস্তার দিকে চোখ রেখে বসে রইল ওরা। কসাকরা চলে আসে কিনা দেখছে।

ককপিটে বসল ওমর। ওড়ানোর চেষ্টা করার আগে গরম করা দরকার। চালু করতে অনেক কায়দা-কানুন করতে হলো, কারণ বরফের মত শীতল হয়ে আছে এঞ্জিনগুলো। বেশ কিছু উদ্বিগ্ন মুহূর্ত আর কয়েকবার ব্যর্থ হবার পর অবশেষে চালু হয়ে গেল একটা এঞ্জিন। তার পর পরই আরেকটা। থ্রটল বাড়াতে ভয় পাচ্ছে ওমর। গর্জন শুনে কৌতূহলী হয়ে যদি দেখতে চলে আসে কসাকরা। মিনিট দশেক চালু করে বন্ধ করে দিল।

এই সময় এসে হাজির হলো পেট্রল বোটটা। গলুইয়ের নিচের পানি কাটার নমুনা দেখেই বোঝা যাচ্ছে গতি খুব বেশি।

'আমাদের দেখেনি এখনও,' বোটটার দিকে তাকিয়ে থেকে ওমর বলল। 'মারকভের কুঁড়ের দিকে চলেছে।'

'আমাদের দেখে ফেলবে,' কিশোর বলল। 'প্লেনের ওপর থেকে নলখাগড়াগুলো পড়ে গেছে। পিঠ বেরিয়ে পড়েছে। দেখে ফেলবে, শিওর।'

'না-ও দেখতে পারে। এদিকে না তাকালে দেখবে না। যাচ্ছে তো দূর দিয়ে।'

'তবু বলা যায় না। দূরবীন থাকতে পারে।'

'দেখে যদি ফেলেই, কি হবে?' মুসা বলল। 'উড়ে চলে যাব।'

'চলে যাওয়ার অনেক ঝামেলা। বোটে নিশ্চয় রেডিও আছে। আমরা আকাশে ওড়ার আগেই বাজানো শুরু হবে ওটা। হয়তো দেখা গেল আমরা ওড়ার সঙ্গে সঙ্গে এসে হাজির হলো এক ঝাঁক ফাইটার প্লেন। তাড়া করল আমাদের। পালিয়ে বাঁচতে পারব না।'

'দেখে ফেলেছে!' চিৎকার করে উঠল কিশোর। 'বললাম না!'

মিস্টার মিলফোর্ড আর মিকোশাও এসে দাঁড়িয়েছে দরজার কাছে।

'হুঁ,' মাথা দোলাল ওমর। 'আর থাকা গেল না। উড়তেই হচ্ছে এবার। যাও, ভেতরে যাও সবাই। মুসা, দরজাটা লাগিয়ে দাও।'

দ্রুত ককপিটের দিকে চলে গেল ওমর। মুসা দরজাটা লাগিয়ে দিল। যার যার সীটে গিয়ে বসল সবাই।

শক্ত হয়ে বসতে বলল ওমর।

ল্যাগুনের ভেতরে গাছপালার আড়ালে থাকাতে ঢেউয়ের দাপট আছটা বোঝা যায়নি, কিন্তু খোলা নদীতে পড়তেই ভয়ানক দোল খেতে আরম্ভ করল বিমান। ওড়ার চেষ্টা চালাল ওমর। গতি বাড়াতে পারছে না ঢেউয়ের জন্যে। তবে ঢেউই শেষ

পর্যন্ত উড়তে সাহায্য করল ওকে। বড় একটা ঢেউয়ের চূড়া ধাক্কা দিয়ে শূন্যে তুলে দিল বিমানটাকে।

মৃদু হাসি ফুটল ওমরের মুখে। বিপজ্জনক এলাকা থেকে যত দ্রুত সম্ভব সরে পড়তে চাইছে। কিন্তু বেশি ওপরে উঠল না। দ্বীপ থেকে আরও কেউ দেখে ফেলতে পারে এই ভয়ে প্রায় পানি ছুঁয়ে ছুটতে লাগল খোলা সাগরের দিকে। মোহনার কাছে পৌঁছে তারপর ওপরে উঠল। সোজা উড়ে চলল জাপান সীমান্তের দিকে।

'আকাশের দিকে নজর রাখো,' পাশে বসা কিশোরকে নির্দেশ দিল সে।

'আর ওপরে উঠবেন না?'

'না। নিচে থাকলে চোখে পড়ার সম্ভাবনা কম।'

দশ মিনিটের মধ্যে একটা অদ্ভুত কালো বস্তুর মত দ্বীপটাকে পেছনে ফেলে এল বিমান। আরও কয়েক মিনিট পর দক্ষিণ দিগন্তে ভেসে উঠল একটা নোংরা অস্পষ্ট কালো দাগ। জাপানের সীমারেখা।

'এসে গেছে!' হঠাৎ বলে উঠল কিশোর।

'কোথায়?'

'লেজ বরাবর পেছনে। পাঁচ হাজার ফুট দূরে।'

'ক'টা?'

'তিন।'

'কাছে আসার আগেই পালাতে না পারলে সলিল সমাধি আছে কপালে,' পেছনে তাকাল না ওমর। শক্ত হয়ে গেল চোয়াল। দৃষ্টি নিবদ্ধ দক্ষিণের দাগটার দিকে। ধীরে ধীরে বড় হচ্ছে ওটা। স্পষ্ট হচ্ছে। 'জাপানের সীমানায় আমাদের তাড়া করার সাহস পাবে না ওরা। রবিনকে বলো এয়ার পোর্টের সঙ্গে যোগাযোগ করতে। বিপদে পড়েছি, জানাতে বলো। বলো সাংবাদিকের প্লেন। এঞ্জিনে গোলযোগ। নামার অনুমতি চাই। আরও বলো, আমাদের সঙ্গে একজন জাপানী পাইলটও আছে। কিছুদিন আগে নিখোঁজ হয়েছিল। তাকে পাওয়া গেছে। দরকার হলে তার নামও জানাতে পারো।'

তাড়াতাড়ি উঠে পেছনে চলে গেল কিশোর।

পরের কয়েকটা মিনিট টানটান উত্তেজনার মধ্যে কাটল। শত্রুদের বিমানগুলো অনেক বেশি আধুনিক। দেখতে দেখতে কাছে চলে এল। গুলির রেঞ্জের মধ্যে পেতে দেরি নেই। ঠিক এই সময় উল্টো দিক থেকে উড়ে আসতে দেখা গেল আরও চারটে বিমান। রবিনের মে-ডে পেয়ে দেখতে আসছে কতটা বিপদে পড়েছে সাংবাদিকের বিমানটা।

চারটে জাপানী বিমানকে দেখে গুলি করতে দ্বিধা করল রাশানরা। এই সুযোগে জাপানের সীমানায় ঢুকে পড়ল ওমর। দুই পাশ থেকে ঘিরে এল জাপানী বিমানগুলো। প্রায় বগলদাবা করে নিয়ে চলল আমেরিকান বিমানটাকে।

রাশানরা সীমানার বাইরে অনিশ্চিত ভঙ্গিতে ঘোরাঘুরি করল কিছুক্ষণ, তারপর ফিরে চলল যেদিক থেকে এসেছিল। বুঝে গেছে, আর লাভ নেই, হাতছাড়া হয়ে গেছে শিকার।

***

ডাকাত সর্দার

প্রথম প্রকাশ ২০০০

'গেছে উধাও হয়ে!' কাঁধের ওপর দিয়ে ফিরে তাকিয়ে বলে উঠল রবিন।

'কে উধাও হয়েছে?' জানতে চাইল কিশোর।

বাকি বীচ মলে ক্রেতার ভিড়ের মধ্যে দিয়ে হেঁটে চলেছে ওরা। সকাল শেষ। দুপুরের দেরি নেই।

'আর কে। মুসা। কোথায় যেতে পারে, বলো তো?'

চারপাশে চোখ বোলাল কিশোর। তারপর হাত তুলল। 'ওই যে, ওপরে যাওয়ার এসক্যালেটরটায়।'

'হুঁ, তাই তো বলি,' মাথা দুলিয়ে বলল রবিন, 'কোথায় যেতে পারে আমাদের মুসা আমান। শিওর, দোতলার রেস্টুরেন্টটায় যাচ্ছে।'

হাসল কিশোর। 'হ্যাঁ, ওর কাছে শপিং মানেই ফাস্ট-ফুড-স্ট্যান্ড।'

দুই বন্ধুকে আসতে দেখে একটা বিমল হাসি উপহার দিল মুসা। 'এসেছ। দোতলাটা একবার ঘুরে আসতে যাচ্ছিলাম। পেটের মধ্যেই জানান দিচ্ছে লাঞ্চের সময় হয়ে গেছে।'

'এ আর নতুন কথা কি,' রবিন বলল। 'তোমার পেট তো সব সময়ই লাঞ্চ, ডিনার, নাস্তার সঙ্কেত দিয়েই চলেছে। তবে খাবারের কথা বলে ভালই করেছ, আমার পেটের খিদেটাও জানান দিচ্ছে।'

এসক্যালেটর থেকে নেমে এসে চারদিকে তাকাতে লাগল তিন গোয়েন্দা। সব ধরনের রেস্টুরেন্টে ভর্তি এ তলাটা। চায়নিজ, ইটালিয়ান, মেক্সিকান, ইনডিয়ান, জাপানী, এমনকি হাওয়াইয়ান খাবারও পাওয়া যায় এখানে। বাতাসে খাবারের সুগন্ধ।

গদগদ ভঙ্গিতে দুই হাত তুলতে লাগল মুসা। 'সবগুলোই টেস্ট করে দেখতে ইচ্ছে করছে আমার।'

কিশোরের দিকে তাকাল রবিন। 'আমি পিৎসাতেই সন্তুষ্ট।'

'আমিও,' কিশোর বলল। একটা ইটালিয়ান স্ট্যান্ডের দিকে রওনা হলো দুজনে।

দুই স্লাইস পিৎসা আর দুটো লেমোনেড শেষ করে ফিরে তাকাল ওরা। মুসাকে দেখতে পেল ডাইনিং সেকশনের মাঝখানের একটা টেবিলে।

এগিয়ে গেল রবিন। 'টেবিল পেলে কি করে?' জিজ্ঞেস করে উঠল সে। 'দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেতে হলো আমাদের!'

বিজ্ঞের হাসি হাসল মুসা। 'ও সব জানতে হয়। এখানকার নিয়ম-কানুন সব আমার মুখস্থ। ঘন ঘন আসি তো।' একটা এগ-রোলের শেষ অংশটা ঠেসে ঠেসে মুখে পুরল সে। 'হ্যাঁ, হয়েছে। এখন বলো কোথায় যেতে হবে। আমি এখন